প্রথম প্রকাশ :
২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭৪
১২ই মাঘ, ১৩৮০

প্রকাশক :
দিলীপ বসু
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক :
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

Swadhinata-Sangrame Dwipantarer Bandi.—By Nalini Das

ভারত-বাংলাদেশ-পাক উপমহাদেশের
স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর শহীদদের উদ্দেশে

ভূমিকা

আমি আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র জনতার সংগ্রামী জীবনের সাথী। কিন্তু একদিন, সেই ত্রিশের দশকে, পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায় আমি ছিলুম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক বিপ্লববাদী যুবক। সেদিন আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল অস্পষ্ট আর অস্বচ্ছ। তাই অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অতুলনীয় ত্যাগ ও বীরত্বের উপর নির্ভর করে আরো অসংখ্য বিপ্লববাদী বন্ধুর সঙ্গে আমিও অগ্রসর হয়েছিলুম ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথে। সেদিন আমাদের সেই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে ছিল গৌরবপূর্ণ আর মহিমান্বিত। কিন্তু তখন আমরা বুঝিনি, মজুর-কৃষক-মেহনতী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রেণীভিত্তিক এই সমাজে আমরা কোন শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রাম করছি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে কোন সমাজ-ব্যবস্থা আমরা কায়েম করতে চাই, তাও ছিল আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অতিবিপ্লবী সেজে জীবন বিসর্জন দিলেই যে স্বাধীনতা আসে না, সামাজিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয় না, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা যায় না, এসব কথাও সেই অন্ধ আবেগ আর উন্মাদনাময় দিনগুলিতে আমরা ভেবে দেখার তেমন কোনো অবকাশ পাই নি।

তাই, ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে গ্রেপ্তারবরণ করলেও ১৯২৪ সালে আমি যুগান্তর পার্টিতে যোগ দিয়ে গ্রহণ করেছিলুম অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা। এরপর থেকেই শুরু হয় আমার সন্ত্রাসবাদের পথ-পরিক্রমা। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় জড়িত থাকার জন্য আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলে আমি আত্মগোপন করলুম এবং ১৯৩০ সালে ধরা পড়ে পৌঁছে গেলুম হিজলীর বন্দী-শিবিরে। ১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে এসে বিপ্লববাদী অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল, চন্দননগর ও কলকাতায় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে আবার অংশগ্রহণ করলুম। এই সময়, ১৯৩৩ সালে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়িতে বন্ধুবর দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখার্জীর সঙ্গে পলাতক-জীবনে পুলিশের সঙ্গে

সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত অবস্থায় ধরা পড়লুম। তারপর ফাঁসির রজ্জুকে ফাঁকি দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড মাথায় নিয়ে ১৯৩৪ সালের একদিন পৌঁছে গেলুম বিপ্লবীদের তীর্থভূমি আন্দামানের সেলুলার জেলে।

এই আন্দামানেই ঘটেছিল আমাদের মতো অসংখ্য মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীর জীবনে নব রূপান্তর। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আন্দামানের দ্বীপান্তরিত বন্দীরা তাঁদের অতীত বৈপ্লবিক জীবনের ভুল-ভ্রান্তিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞানের আলোকে নতুন বৈপ্লবিক পথের সন্ধান পেয়েছেন, মার্কসবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছেন—তাই মূলত আমার এই গ্রন্থের অন্বিষ্ট।

আন্দামান-রাজবন্দীদের এই জীবনকথা লিখবার জন্য বাংলাদেশের বন্ধুরা আমাকে বারংবার অনুরোধ করেছেন। তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়েও অতীতে আমি অনেকবার পিছিয়ে এসেছি। কারণ, আন্দামানের-রাজবন্দীদের কথা লিখতে গেলে ভারত-বাংলা-পাক উপমহাদেশের প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি ইতিহাসবিদ কিংবা লেখক—কোনটাই নই। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আমার স্মৃতিও আজ দুর্বল। অর্ধশতাব্দী আগের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অজস্র ঘটনাবলী—যা আমার জানা ছিল, আজ তাও প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছি। তবু মনের মণিকোঠায় যতটুকু স্মৃতি এখনও বেঁচে আছে তার উপর নির্ভর করেই আমি শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বীর-বন্দীদের কথা লিখতে চেষ্টা করেছি।

এই প্রসঙ্গে পাঠক-বন্ধুদের কাছে একটা কথা নিবেদন করতে চাই। পরাধীন ভারতে দীর্ঘ ১৭ বৎসর পলাতক-জীবন আর কারাজীবন অতিবাহিত করার পর ১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমি মুক্ত-জীবনে ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। আমি সেই থেকে পড়ে আছি আমার আবাল্যের স্মৃতিবিজড়িত পূর্ব বাংলায়। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব বাংলার মানুষকে ছেড়ে ভারতে চলে আসার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। কারণ, পূর্ব বাংলাই ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এর ফলে পাকিস্তানী আমলের স্বৈরতান্ত্রিক লীগ-শাসনে কিংবা পরবর্তীকালের বর্বর সামরিক-শাসনে আমার মতো মানুষের নিত্য সঙ্গী হয়েছিল কারাগার আর

পলাতক-জীবন। ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত ২৩ বৎসর তাই আমাকে কাটাতে হয়েছে কারাগারে কিংবা পলাতক জীবনের আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ পথে।

এই পরিবেশে আয়ূবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মজুর-কৃষক, ছাত্র-যুবক-মধ্যবিত্ত তথা মেহনতী মানুষ যখন ১৯৬৮-৬৯ সালে বুকের রক্ত ঢেলে গণ-অভ্যুত্থানে সামিল হলো, আয়ূবের স্বৈরাচারী সামরিক-শাসনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হলো, তখন পূর্ব বাঙলার সেই গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আমাদের অতীত স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করলেন আমার সহযাত্রী বন্ধুরা। প্রকৃতপক্ষে, তখন থেকেই আমার অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দীদের কথা লেখার জন্য আমি চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু পলাতক-জীবনের সীমাবদ্ধতায়, বিশেষ করে ভারতে প্রকাশিত স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং বিপ্লববাদী আন্দোলন সম্পর্কে গ্রন্থাদি কিংবা আন্দামানের রাজবন্দীদের জীবন-ইতিহাস হাতের কাছে না পাওয়ার ফলে আমাকে মূলত স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই এই গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হতে হয়েছে।

যাহোক, গ্রন্থটি লেখার কাজ শেষ হলে তৎকালীন পূর্ব বাঙলার বন্ধুরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর এটিকে প্রকাশ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের গতি আমার অন্যদিকে মোড় নিল। বর্বর ইয়াহিয়া তার সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিল পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে। সেই বর্বরতার আগুনে যখন পূর্ব বাঙলা জলছে তখন আমার এই গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি যে-বাড়িতে সংরক্ষিত ছিল সেটিও পুড়ে ছাই হলো। ফলে, আসল পাণ্ডুলিপির হদিস আর মেলে নি। এই গ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপিটি অন্যত্র থাকায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শরণার্থী বন্ধুদের সঙ্গে সেটি ভারতে এসে পৌঁছায়। আমার পুরনো দিনের বন্ধুরা সেই খসড়া পাণ্ডুলিপিটিই সংশোধন করে 'কালান্তর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

তারপর মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন পূর্ব বাঙলার মানুষ। স্বাধীনতাকামী বীর জনতার অপূর্ব আত্মত্যাগে, ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে, ভারতীয় জনগণ ও সরকারের অতুলনীয় সহযোগিতায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ প্রগতিশীল দুনিয়ার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙলাদেশ। আমার রচনাটিও এতকাল পরে নানা বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হতে চলেছে। কিন্তু যে-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল প্রধানত তৎকালীন পূর্ব বাঙলার তরুণ সংগ্রামী-বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে, যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তৎকালীন পূর্ব বাঙলায়, আজ সেই গ্রন্থের প্রকাশ ঘটছে আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্র ভারতবর্ষে। ইতিহাস-বিধাতার এও বোধহয় এক চরম কৌতুক!

প্রসঙ্গক্রমে তাই ভারতীয় পাঠক-বন্ধুদের কাছেও আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করার আছে। আমি জানি, ভারতবর্ষের বহু গবেষক তাঁদের শ্রম ও নিষ্ঠায় ইতিমধ্যেই রচনা করেছেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহুবিধ অমূল্য ইতিহাস। তাঁদের সেই সব গ্রন্থের পাশে আমার এই গ্রন্থ হয়তো অকিঞ্চিৎকর। তবু, তিরিশ আর চল্লিশের দশকে বিপ্লববাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিপ্লবী-জীবনের পালাবদলের যে-ইতিহাস আমি প্রত্যক্ষ করেছিলুম, বিশেষ করে আন্দামানের সেলুলার জেলে আমরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে মার্কসবাদী বিশ্ব-বীক্ষার সাহায্যে যেভাবে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলুম, আমার জানা ও দেখা সেই ইতিহাসটুকু যদি তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেন, তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমি পূর্বেই বলেছি, এই গ্রন্থ মূলত আমার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখিত। আর, কে না-জানে স্মৃতি ভীষণ প্রতারক। তাই এই গ্রন্থে অসাবধানবশত কোনো ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকলে আমি তা সংশোধনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। একদা আন্দামানে দ্বীপান্তরিত আমার যেসব পুরনো বন্ধু এই গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, আজ এই সুযোগে তাঁদের সকলের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাঙলাদেশে নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় আমি বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারি নি। সাথী ও সুসাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত, আন্দামানের সাথী বঙ্কেশ্বর রায় ও রণধীর দাশগুপ্ত এবং 'মনীষা'-র বন্ধু দিলীপ বসু এই গ্রন্থের প্রকাশনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আর, আমার অনুজপ্রতিম সাহিত্যিক-বন্ধু ধনঞ্জয় দাশ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে এবং পরিমার্জনায় যে শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় করেছেন, সত্যিই তা দুর্লভ। এঁদের সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বরিশাল, বাঙলাদেশ
স্বাধীনতা দিবস
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

নলিনী দাস

বিষয়সূচী

আন্দামান, কালাপানি, দ্বীপান্তর…

আন্দামান, কালাপানি, দ্বীপান্তর—উনিশ শতক আর বিশ শতকের প্রারম্ভে এই কথাগুলো সাধারণ মানুষের মনে কী ভীতি আর আতঙ্কই না সৃষ্টি করত! এখনকার দিনের মানুষ সেসব কথা কল্পনাও করতে পারবে না। দ্বীপান্তরে যাওয়া মানে চিরদিনের জন্যে যাওয়া; দ্বীপান্তরিত মানুষ কোনদিন স্বদেশে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর ফিরে আসবে না, এই ছিল সকলের বদ্ধ ধারণা। আন্দামান হলো বিভীষিকাময় নরক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা প্রধানত হিংস্র পাশবিক দমননীতির দাপটেই উপমহাদেশকে দাবিয়ে রেখেছিল। জেলখানাগুলি ছিল তাদের এই দমননীতির এক বড় হাতিয়ার। সুদূর আন্দামান দ্বীপেও তারা তাই জেলখানা তৈরী করেছিল। আর, খোপ খোপ করা এই বিশাল কারাগারের নাম রেখেছিল তারা সেলুলার জেল। দুর্ধর্ষ এবং বিপ্লববাদী বন্দীদের পিষে মারার জন্যেই এখানে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল অমানুষিক সব ব্যবস্থাপনা।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ শাসকেরা ঠিক করে নিয়েছিল যে, যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদের মধ্যে যারা ফাঁসিকাঠ থেকে রেহাই পাবে, তাদের সকলকেই পাঠানো হবে আন্দামানে।

বর্তমান শতাব্দীতেও তারা এই সিদ্ধান্ত চালু রেখেছিল। তিরিশের দশকে বাঙলার বিপ্লববাদী মেয়ে-বন্দীদেরও আন্দামানে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছিল তারা। কিন্তু যে কারণেই হোক শেষপর্যন্ত এটা করতে সাহস করে নি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের উত্থান-পতনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শরিক হওয়ার ইতিবৃত্তের সঙ্গে আন্দামানের রাজবন্দীদের জীবনধারা অনেকখানিই জড়িত ছিল।

উনিশ শতকের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামগুলোর অধিকাংশই ছিল পশ্চাৎপদ সমাজের অসংগঠিত কৃষক-বিদ্রোহ। সুতরাং সেদিন যারা আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিল, তারা মধ্যযুগীয় ভাবধারা এবং ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন মন নিয়েই দ্বীপান্তরে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে তখন সবেমাত্র অতি সামান্য শিল্প-বিকাশ শুরু হয়েছে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীরও জন্ম হয়েছে চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত শিক্ষার বৃত্তিধারী হিসাবে। ভারতের মাটিতে মজুরশ্রেণী তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে। আর, কৃষকসমাজ সংগঠিতভাবে তখনও রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি।

এই সময় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের নেতাদেরও লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট। অনেক স্থানে সামন্তরাজারা এবং ভূস্বামীরাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ওহাবি-আন্দোলন, ফকির-বিদ্রোহ, পিণ্ডারী-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, নীলচাষী-বিদ্রোহ ইত্যাদির সবগুলিই ছিল মুখ্যত কৃষক-বিদ্রোহ। এই সমস্ত অভ্যুত্থানের পরে যেসব বিদ্রোহী জীবিত থেকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা পেয়েছিলেন, তাঁদের সকলের জীবনে কি ঘটেছিল আমরা তা জানি না; তবে সিপাহী-বিদ্রোহ, মোপলা-বিদ্রোহ এবং থারোয়াড়ি-বিদ্রোহের বন্দীদের আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, একথা আমাদের অজানা নয়। এই সমস্ত বীরবন্দীদের উপর যে নির্যাতন চলতো তার

প্রতিবাদে সেদিন দেশে কোনো গণ-আন্দোলন হয় নি। এই সব বন্দীর অধিকাংশের জীবনই কালাপানির অতলতলে শেষ হয়ে গেছে। তাঁরা কোনদিন রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা তো দূরের কথা, এমনকি দু-বেলা পেট ভরে খেয়ে মানুষ হিসাবে বাঁচারও সুযোগ-সুবিধা পান নি। এই সমস্ত বন্দীর জীবনে কি ঘটেছিল সেই হৃদয়বিদারক ইতিহাস আজও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। পরবর্তী সময়ে দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম যখন কিছুটা ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ নিয়েছে তখন প্রধানত কৃষক-সমাজের মধ্য থেকেই সংগঠিত মালাবার-বিদ্রোহ (১৯২১), মোপলা-বিদ্রোহ (১৯২২), চৌরিচেরা-বিদ্রোহ (১৯২৩-২৪), থারোয়াড়ি-কৃষক-বিদ্রোহ (বার্মা) প্রভৃতি মামলায় দণ্ডিত দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের আন্দামানে প্রেরণ করা হলেও এই সব বন্দীরাও কোনদিন রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পান নি। তাঁদের অনেকেরই সুদূর আন্দামানে নিঃশব্দ নিষ্ঠুরতায় জীবনের অবসান ঘটেছে।

উনিশ শতকের দিনগুলোতে আন্দামান-বন্দীরা পশুর থেকেও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করেছেন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি ঘটনা আজও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান ভ্রমণে গেলে মাউন্ট জোরিয়েট দ্বীপের সমুদ্রতীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলী নামক পেশোয়ার জেলার একজন পাহাড়ী আফগান-যুবক বড় লাটকে ছুরিকাহত করেন। হত্যার অপরাধে বিচারের পর শের আলীর ফাঁসির হুকুম হয়। এই যুবক ব্রিটিশ-বিরোধী ওহাবি-আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পশুর মতো মৃত্যু অপেক্ষা বীরের মতো মৃত্যুকে তিনি শ্রেয় মনে করেন। ব্রিটিশ-বিরোধী ঘৃণা ও ক্রোধ বেপরোয়া করে তুলেছিল তাঁকে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন যে, কোনো একজন বড় ব্রিটিশ অফিসারকে যেভাবেই

হোক তিনি হত্যা করবেন। সেইসময়ে তিনি একটা ধারালো ছোরা সংগ্রহ করে রাখেন। ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ছোরাখানাকে আবার ধার দিয়ে নেন। এই নির্ভীক যুবা গর্বের সঙ্গে কোর্টে ঘোষণা করেছিলেন : "আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে।" তিনি ছিলেন ক্ষীণকায়, ছোটখাটো দেখতে। কিন্তু তাঁর ছিল অসীম সাহস আর মৃত্যুভয়হীন দৃঢ়তা। ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণের পর তিনি কয়েদীদের সম্বোধন করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন : …"ভাই সব, আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি।"

আন্দামানের দ্বিতীয় পর্যায় : পটভূমি

অভিরামের দ্বীপ চালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

কালাপানি সম্বন্ধে ভীতি আর অজ্ঞতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনে একটা নতুন ধারণাও জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকেই। উপরের গানটি তারই প্রমাণ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহগুলিকে দমন করে বিদ্রোহীদের অনেককে ফাঁসিকাঠে লটকে কিংবা তাঁদের অনেককে আন্দামানে চালান করে দিয়ে মনে করছিল ভারতবাসী ব্রিটিশ-শাসন মেনে নিয়েছে, তখন উল্টোদিক থেকে সচেতন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের হাওয়াও বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়াটা নিছক হাওয়াতেই নিবদ্ধ থাকে নি। আপাত-নিস্পন্দ গণ-সমুদ্রে ছোট বড় ঢেউও তখন উঠতে শুরু করেছিল। এই ঢেউ-এর একদিকে ছিল রাজনৈতিক জলসা-জমায়েত, আর এক দিকে ছিল সুসংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিকার্য। এই দুটি ধারাতেই ছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের প্রাধান্য। কিন্তু এই দুটি ধারার মধ্যেই যে ভারতের গণসমুদ্রের অন্তঃস্থল নাড়া খেতো, তারও প্রমাণ উপরের লোকসংগীতটি।

হয় ফাঁসি, নয় দ্বীপান্তর—এটাই ছিল প্রত্যেকটি বিপ্লবী স্বদেশী মামলার শেষ পরিণতি—এই বার্তাই ক্রমে ক্রমে রটে গিয়েছিল। আন্দামান-প্রসঙ্গে এই মামলাগুলি এবং তার পটভূমিকে তাই স্মরণ করা দরকার।

বিশ শতকের শুরু থেকে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত যেসব বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হয় তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের কোন কোন স্তর বা শ্রেণী থেকে এসেছিলেন, এটা জানলে ভারত-বর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান চেতনা এবং গভীরতারও একটা নিশানা পাওয়া যাবে। জানা যাবে এর সীমাবদ্ধতাও।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অভ্যুত্থান-এর হিসেব নিলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসব যে, বাঙলা ছিল বিপ্লব-প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। বাঙালী ছেলেরা—যারা বিচারে ফাঁসিকাঠ থেকে রেহাই পেয়েছিল, তারাই প্রথমদিকে প্রেরিত হয়েছিল আন্দামানে বেশি সংখ্যায়; তবে একথাও ঠিক, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকেও বিপ্লবীদের আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। তখন এই সংগঠনের বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর নেতারা দরখাস্ত মারফত কিছু কিছু সুযোগসুবিধা পাবার জন্য বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করে চলতেন। কিছুদিন পরেই কংগ্রেসের ভিতর দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি বাঙলা ও মহারাষ্ট্রে কিছু কিছু বামপন্থী কর্মী আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে কংগ্রেসের বাইরে বিপ্লববাদী সশস্ত্র-সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল কৌশল ছিল: "বিভক্ত রাখো ও শাসন করো।" এই পলিসি অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯০৫ সালে বাঙলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। সে-সময়ে সারা বাঙলায় গণ-আন্দোলন ঊর্ধ্বমুখী; ইতিমধ্যে কিছু কিছু শিল্প-বিকাশ

হয়েছে—জন্ম নিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। বাঙালী জাতীয়তা-বোধও অনেকখানি জাগ্রত হয়েছে। অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত বাঙালী জনতা এই বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। তখন গোটা ভারতেও ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় চেতনা কিছুটা বিকাশ লাভ করেছে। একদিকে আবেদন-নিবেদন এবং অপর দিকে গণ-আন্দোলন ও বোমা-পিস্তল নিয়ে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ ধীরে ধীরে চলছে। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অতি গোপনে সংগঠিত দল গঠনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। সমাজের সবচেয়ে চরিত্রবান, সাহসী, দেশপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু কর্মীদের নিয়ে দলগঠন চলেছে। সেই সময়ে বাঙলাদেশে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি নামে দুইটি সন্ত্রাসবাদী গোপন বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠেছিল। বাঙলা বিভাগের বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালী জাতি রুখে দাঁড়াল। আবেগ ও সংবেদনশীল বাঙালী জাতি আন্দোলন শুরু করল। বাঙলার জাতীয় কংগ্রেসও বিলাতী দ্রব্য-বর্জন আন্দোলনের ডাক দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বাঙলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল—শত শত কর্মীকে গ্রেপ্তার, সর্বত্র লাঠিপেটা, গুলি ইত্যাদি শুরু হলো। এই নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদী দলগুলো অত্যাচারী সাহেব ও সরকারী কর্মচারী-হত্যার এক কার্যক্রম গ্রহণ করল। বোমা তৈরী, পুলিশ ব্যারাক উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র, ডাকাতি করে অর্থ-সংগ্রহ, স্থানে স্থানে বৈপ্লবিক কর্মীদের আড্ডা স্থাপন করে ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতিও পুরোদমে চলছিল। এইভাবে অজ্ঞতা আর ভয়-ভীতির অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে বীর-বিপ্লবী সাহসী যুবকেরা হাসতে হাসতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল।

বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনকে অধিকাংশ জনতা সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দেশের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অধিকাংশই দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে অজস্র গান, কবিতা, যাত্রা ও কবি-

গানের মাধ্যমে তাঁরা সমস্ত বাঙালী জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল নীচের স্বদেশী সঙ্গীতে :

১) "আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

২) "বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর ছিন্ন বসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ।"

৩) "বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমরা কি মার সেই ছেলে।
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে।"

এমনি বহু গান এবং প্রধানত মুকুন্দ দাসের যাত্রা সেদিন সমস্ত দেশকে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিল।

অনেকে বলেন, মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু এটা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক কারণেই মুসলিম সমাজ তখনও শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-সমাজ তখনও গড়ে ওঠে নি। মুসলিম বা হিন্দু সামন্তবাদী জমিদার, নবাব, রাজা-মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠী সর্বদাই স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। এরা ছিল অধিকাংশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল। সেই দিনে মুসলিম শিক্ষিত সমাজে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ রসুল (কুমিল্লা, ব্যারিস্টার) বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী-আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। বরিশালে ১৯০৬ সালের

ঐতিহাসিক প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। ঐ কংগ্রেস-সম্মেলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং অনেকের মাথা ফাটিয়ে ঐ কনফারেন্স ভেঙে দেয়। পরে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত থেকে শুরু করে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রসিদ্ধ নেতা লিয়াকৎ হোসেন, বর্ধমানের বিখ্যাত নেতা আবুল কাশেম প্রভৃতি অনেকেই এই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন করেছিলেন। শুনলে আজ আশ্চর্য মনে হতে পারে, ঢাকার নবাব পরিবারের একটি অংশও বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিল।

গণ-আন্দোলনের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে, প্রধানত বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপের প্রসারকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র কিছুটা পিছু হটে। তারা ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে। বলা-বাহুল্য, বঙ্গ-ভঙ্গ রদেই বিপ্লববাদীরা সন্তুষ্ট থাকেন নি।

বিদেশী ব্রিটিশ সরকারকে সমূলে উচ্ছেদ করে এবং পরাধীনতার অভিশাপকে নির্মূল করেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটাই ছিল বিপ্লববাদীদের প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্য। এই সমস্ত বিপ্লববাদী দলগুলি ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, ডি'ভ্যালেরা প্রমুখের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইরিশ মুক্তিবাহিনীর মতো ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করবে, এটাই ছিল তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী।

১৯০৫ থেকে ১৯০৯ সালে বাঙলা ও মারাঠার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সত্যেন বসুর ফাঁসি হয়ে যায়। বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত মানিকতলা বোমার মামলায় বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়। হাই-কোর্টে তাঁদের ফাঁসির দণ্ড নাকচ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। মানিকতলা বোমার মামলায় বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল হাজরা এবং মারাঠার নেতা বীর সাভারকর ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাই পরমানন্দ প্রভৃতিকে

অপর একটি মামলায় যাবজ্জীবন ও দীর্ঘ মেয়াদী সাজা দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

বাঙলাদেশের মতো এত ব্যাপক আন্দোলন না হলেও অন্যান্য অঞ্চলেও বিপ্লববাদী আন্দোলন চলছিল।

১৮৯৬ সালে মারাঠা প্রদেশে প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা জোর জবরদস্তি করে—এমন কি মহিলাদের উপর অত্যাচার করে প্রতিষেধক ইনজেকশন্ দেবার ব্যবস্থা করে। দামোদর হরি চাপেকর ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ হরি চাপেকর ছিলেন বাল গঙ্গাধর টিলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবাজীসঙ্ঘের সভ্য। এই দুই ভাই ১৮৯৬ সালে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট নামে দুই জন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে এই সব অত্যাচারের জন্য দায়ী মনে করে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে ১৮৯৭ সালে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। একথা স্মরণযোগ্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের পরে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ই ভারতের বিপ্লববাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদ।

এরপর ১৯০৯ সালের ২১ ডিসেম্বর নাসিকে জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য অনন্ত লক্ষ্মণ কানহারে, কৃষ্ণজী গোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের ফাঁসি হয় এবং নারায়ণ দেশপাণ্ডেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯১১ সালের ১৭ জুন মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিনোভেলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ্যাস সাহেবকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য বঞ্চি আয়ারের ফাঁসি হয়।

১৯০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলার শোভনা গ্রামের চারুচন্দ্র বসু সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাসির হুকুম হয়।

১৯১২ সালের ২৯ ডিসেম্বর বসন্ত বিশ্বাস বড় লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। এর ফলে লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হন। আর এই

অপরাধে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

মদনলাল ধিংড়া নামে এক যুবক স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে লণ্ডন শহরে এক সভায় ১৯০৯ সালে হত্যা করেন। তিনি ফাঁসির হুকুম শুনে বিচারককে বলেছিলেন: **"Thank you my Lord, I am glad to have the honour of dying for my country."** অর্থাৎ, 'মাননীয় বিচারপতি, আমার দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করার যে সম্মান আমি লাভ করেছি সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

প্রথম মহাযুদ্ধকালে বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ গোটা ভারতে জোর কদমে চলছিল। ব্রিটিশের বিপদ—ভারতের সুযোগ, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে বিপ্লববাদীরা দেশে ও বিদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী জীবন-পণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বহু সরকারী কর্মচারী হত্যা এবং বিপ্লববাদীদের ফাঁসি ইত্যাদি কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এই সময় একমাত্র বাঙলাদেশেই ১৫০০ বিপ্লববাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বিভিন্ন দল ও গ্রুপ কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে কখনও পৃথক পৃথক ভাবে এবং নানা নেতাও ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর ভিতরে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ করাবার চেষ্টা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই বিপ্লববাদী বহু নেতা বিদেশে পালিয়ে যেয়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে পাঠাবার চেষ্টা করেন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী জার্মান সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাবার বন্দোবস্ত করেন। এমন কি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে (ইউ. পি) প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং বরকতুল্লাহকে (যুক্ত প্রদেশ) প্রধানমন্ত্রী করে সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট রূপে ঘোষণা করা হয়। এই বিপ্লববাদীদের সকলেরই গৌরবপূর্ণ বিপ্লবী ইতিহাস রয়েছে। এই সমস্ত বিপ্লবী নেতাদের মাঝে যাঁরা বিদেশে কাজ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন

তাঁরা হলেন (১) বরকতুল্লাহ (২) সুফী অম্বাপ্রসাদ (কাবুল জেলে মৃত্যু হয়েছিল) (৩) ওবেদুল্লাহ (সিন্ধি) (৪) নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়, বাঙলা) (৫) লালা হরদয়াল (পাঞ্জাব) (৬) সর্দার অজিত সিং (পাঞ্জাব) (৭) রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ (ইউ. পি) (৮) রাসবিহারী বসু (বাঙলা) (৯) ডঃ ভূপেন দত্ত (বাঙলা) (১০) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বাঙলা) (১১) জাফরালী খাঁ (যুক্ত প্রদেশ) (১২) ডঃ মনসুর আহম্মদ (যুক্ত প্রদেশ) (১৩) মির্জা আব্বাস (বিহার) (১৪) আবদুল ওয়াহেদ (বিহার) (১৫) সিদ্দিক আহম্মদ (ইউ. পি) (১৬) ধনগোপাল মুখার্জী (বাঙলা) (১৭) শৈলেন ঘোষ (বাঙলা) (১৮) তারকনাথ দাস (বাঙলা) (১৯) অবনী মুখার্জী (বাঙলা) (২০) নলিনী গুপ্ত (বাঙলা) (২১) ফিরোজউদ্দীন মনসুর (লাহোর) (২২) ফজল এলাহী কোরবান (লাহোর) (২৩) শওকৎ ওসমানী (বিকানীর)। (২৪) মীর আবদুল মজিদ (লাহোর) প্রভৃতি।

এই সময়ে ভারতের কানপুর, লাহোর, বেনারস, ব্যারাকপুর, লুধিয়ানা, রাওয়ালপিণ্ডি, মিরাট, শিয়ালকোট, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবীরা সৈনিকদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। বহু স্থানে বিদ্রোহের পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়ে সৈন্যদের এদিক-ওদিক সরিয়ে দেয় এবং নেতৃস্থানীয় সৈনিকদের ফাঁসি ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করে।

বিপ্লববাদীদের এই ষড়যন্ত্রের ফলেই বার্মা ও সিঙ্গাপুরে বেলুচ রেজিমেণ্ট ও অন্যান্য সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করে সিঙ্গাপুর শহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সৈন্যরা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এই শহর দখল করে রেখেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যের সাথে লড়াই করে অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়। যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁদের

অধিকাংশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামান পাঠানো হয়।

ঝুঁটা খান নামে এমনি এক পাঠান সৈনিকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল আন্দামান সেলুলার জেলে, তিরিশের দশকে। সে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড খেটে সেলুলার জেলেই সিপাহীর চাকরি পেয়েছিল। সে সর্বদাই আমাদের বলত, "নাম মে ঝুঁটা হ্যায়, কাম মে ঝুঁটা নেহি।"

১৯১৬ সালে আলী মুহম্মদ ও কাশেমালী ১৩০ নং বেলুচ-রেজিমেণ্টের ভিতর বিপ্লবীদল গঠন করেছিল। রেঙ্গুনে এই রেজিমেণ্ট ঠিক করে নিয়েছিল যে তারা বকরী-ঈদের দিন বকরী কোরবানী করবে না। সাহেবদের কোরবানী করে তারা ঈদ-উৎসব পালন করবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ব্যারাক ঘেরাও করে বহু সৈন্যকে হত্যা করে। যারা বেঁচেছিল তাদের অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয় বা যাবজ্জীবন দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। বিদ্রোহী বেলুচ-রেজিমেণ্টের প্রায় ২০০ সৈন্য বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মোহনলাল পাঠক আর মোস্তাফা হোসেন। ফাঁসিতে ঝুলাবার পূর্বে লাট সাহেব জেলে গিয়ে মোহনলালকে বলেছিল, ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাঁর প্রাণদণ্ড রহিত হবে। স্বাধীনতা-সংগ্রামী সেই নির্ভীক বীর বলেছিলেন: "যদি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় তবে ইংরেজ সরকারকেই ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। কারণ, আমাদের জন্মভূমিতে তাদের কোনো অধিকার নেই।"

বিদেশে বসবাসকারী পাঞ্জাবী অধিবাসীরা একটি বিপ্লবী দল গঠন করে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দলের নাম ছিল 'গদর', মানে বিপ্লবী পার্টি। এঁরা আমেরিকা, কানাডা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘাঁটি করে কাজ শুরু করেন। এঁদের মুখপত্র হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে 'গদর' নামে একটি পত্রিকা বের হতো। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী লালা হরদয়াল এই পত্রিকার

সম্পাদক ছিলেন। "হয় মাতৃভূমির মুক্তি, অথবা মৃত্যু"—এটাই ছিল পত্রিকার মূল আওয়াজ।

এই দলের কিছু বীর-কর্মী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে ১৯১৫ সালে দেশে এসে বিপ্লবী সংগ্রাম করবার জন্য জাপানী জাহাজ "কামাগাটা মারু" ও 'টসামারু'তে চড়ে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। এই দলের কর্মীরাই সিঙ্গাপুর, হংকং এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈনিক-দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

এঁদের কলকাতার গার্ডেনরীচে এসে পৌছবার খবর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ পূর্বেই পেয়ে গিয়েছিল। 'কামাগাটামারু' জাহাজ নোঙ্গর করার সাথে সাথে সশস্ত্র সৈনিকরা জাহাজ ঘেরাও করে ফেলে। বিপ্লবীরাও সশস্ত্র সৈনিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বেশ কিছু বিপ্লবী কর্মীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁদের কয়েকজনার ফাঁসি হয় এবং অন্যান্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। এঁদের মধ্যে সর্দার গুরুমুখ সিং, পৃথ্বী সিং, কর্তার সিং, গুরু গোবিন্দ সিং প্রভৃতির নাম এখনও স্মরণীয়।

লাহোরে শিখ এবং অন্যান্য পাঞ্জাবী সৈন্যদের ভিতর ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র ক্রমেই দানা পাকিয়ে উঠছিল। বার বার এই আন্দোলনের কথা এবং সৈন্যদের বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়তে থাকে। এই সমস্ত সৈন্য ও পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলায় তিন দফায় ৯০ জনের ফাঁসির হুকুম হয় ও ৮০০ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। পরে অবশ্য অনেকের সাজা হাইকোর্ট কমিয়ে দেয়। ২৪ জনের ফাঁসি হয় এবং ৭২ জনকে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। যাঁদের ফাঁসী হয়েছিল তাঁদের মধ্যে গণেশ বিষ্ণু পিংলে, সর্দার জগৎ সিং, সর্দার সুরণ সিং, সর্দার সুবল সিং, সর্দার হরনাম সিং, কর্তার সিং প্রভৃতি ছিলেন।

যাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে (১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিং তুন্দ্রা (৩) কেদার সিং (৪) মুখল সিং (৫) নন্দ সিং (৬) পৃথ্বী সিং (৭) রুলা সিং (৮) সেওয়ান সিং (৯) মোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১১) ভাই পরমানন্দ (১২) পণ্ডিত পরমানন্দ (১৩) হর্দেরাম (১৪) রামশরণ দাস (১৫) জত্রিৎ রাও (১৬) গুরুমুখ সিং (১৭) জোয়ালা সিং (১৮) শেব সিং (১৯) পণ্ডিত জগ্যরাম (২০) নিধন সিং (২১) কেশব সিং (২২) বিশাখা সিং (২৩) রুর সিং (২৪) ভাগ সিং (২৫) কেহর সিং (২৬) উধম সিং (২৭) পারা সিং (২৮) কৃপাল সিং (২৯) ইন্দ্র সিং (৩০) লাল সিং (৩১) মাল সিং (৩২) কানা সিং (৩৩) নাথ সিং (৩৪) শিব সিং (৩৫) সজ্জল সিং প্রভৃতিরা ছিলেন।

দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলায় অধ্যাপক আবদ বিহারী ও শিক্ষক বাল মুকুন্দ আমির চাঁদের ১৯১৪ সালে আম্বালা জেলে ফাঁসি হয়। বাল রাজকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে প্রেরণ করা হয় আন্দামানে।

১৯১৫ সালে ৩০ এপ্রিল নদীয়া জেলার প্রাগপুরে একটি ডাকাতিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সুশীল সেনের মৃত্যু হয়। এই মামলায় আশুতোষ লাহিড়ী, গোপেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল, ফণিভূষণ রায়—এঁরা প্রত্যেকে দশ বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

১৯১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামে ডাকাতি হয়। এই মামলায় নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন নন্দী, সত্যরঞ্জন বসু, নিখিলরঞ্জন গুহরায়, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, অনুকূল চ্যাটার্জি ও সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁদের সকলকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯১৫ সালে বাঘা যতীন মুখার্জী ওড়িষ্যার সমুদ্রতীরে বালেশ্বরে

জার্মান অস্ত্রশস্ত্র নামার আশায় গমন করেছিলেন। কলকাতার পুলিশ অফিসার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তাঁর দলকে অনুসরণ করে। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বুড়ী বালামের তীরে পুলিশের সাথে বিপ্লববাদীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। (১) চিত্তপ্রিয় রায়—পুলিশের গুলিতে নিহত হন। (২) বাঘা যতীন মুখার্জী—আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। (৩) নীরেন মুখার্জী ও (৪) মনোরঞ্জন সেনের ফাঁসী হয়, আর (৫) যতীশ পাল গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯১৭ সালে সিরাজগঞ্জে গোবিন্দ কর ও নিকুঞ্জ পালকে পুলিশ ঘেরাও করে। পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধে তাঁরা উভয়েই আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘমেয়াদী সাজা দিয়ে তাঁদের আন্দামানে পাঠানো হয়।

১৯১৮ সালে পলাতক অবস্থায় নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদারের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়। নলিনী বাগচীর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয়। তারিণী মজুমদার ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সুধীর মজুমদারকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এবং পরে বাঙলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সরকারী কর্মচারীহত্যা, স্বদেশী ডাকাতি, বোমা তৈরী প্রভৃতি বিভিন্ন মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন :

(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (২) উল্লাসকর দত্ত (৩) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪) অমৃতলাল হাজরা (৫) গণেশ দামোদর সাভারকর (৬) বিনায়ক দামোদর সাভারকর (৭) নারায়ণ যোশী (৮) প্রফেসর ভাই পরমানন্দ (৯) সর্দার জাবালা সিং

(১০) দত্তর সিং (১১) নিধান সিং (১২) কেশর সিং (১৩) বুত্তা সিং (১৪) শের সিং (১৫) অমর সিং (১৬) বিশাখা সিং (১৭) রুর সিং (১৮) সোহন সিং (১৯) নন্দ সিং (২০) জ্ঞান সিং (২১) কেহের সিং (২২) পণ্ডিত পরমানন্দ (২৩) পণ্ডিত জনতরাম (২৪) পণ্ডিত রামশরণ দাস (২৫) পণ্ডিত রামরক্ষা চৌধুরী (২৬) বেগগামল (২৭) মথথন তাঁরাচাদ (২৮) মহম্মদ মোস্তাফা (২৯) আলী আহম্মদ (৩০) কাশেম মিঞা (৩১) পুলিনবিহারী দাস (৩২) হেমচন্দ্র দাস (৩৩) সুরেশচন্দ্র সেন (৩৪) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) (৩৫) মদনমোহন ভৌমিক (৩৬) খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৩৭) নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (৩৮) ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ (৩৯) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (৪০) আশুতোষ লাহিড়ী (৪১) নিকুঞ্জ পাল (৪২) গোবিন্দ কর (৪৩) মহেন্দ্র দাস (৪৪) যতীন নন্দী (৪৫) সত্যরঞ্জন বসু (৪৬) গোপালচন্দ্র রায় (৪৭) ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল (৪৮) নিখিলচন্দ্র গুহরায় (৪৯) অনুকূল চ্যাটার্জী (৫০) সুরেন বিশ্বাস এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের আরও ৫০ জন দীর্ঘমেয়াদী বন্দী।

১৯১৪-১৯ সালে কিছুটা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে স্বীকৃত এইরূপ রাজবন্দীর সংখ্যা ছিল আন্দামানে প্রায় এক শত। এছাড়া বিদ্রোহী সৈনিক, বিদ্রোহী কৃষক-বন্দী ছিল শত শত কিন্তু এরা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে কোনদিন স্বীকৃতি পায় নি।

এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীরাও আন্দামানে কোনদিন সত্যিকার রাজবন্দী হিসাবে খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান পান নি। এই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকে দিয়ে চোর-ডাকাত প্রভৃতি সাধারণ কয়েদীদের মতো ঘানি টানানো, ডাল ভাঙানো, ছোবড়ার দড়ি পাকানো প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে নেওয়া হতো। এঁদের মাঝে যাঁরা শিক্ষিত ছিলেন তাঁদের সাধারণ কয়েদীদের মতো ৩।৪ মাস পরে উপনিবেশে ছেড়ে দিয়ে কয়েদীক্যাম্পে রেখে কাজ

করানো হতো। এঁদের মধ্যেও বেশ কিছু লোকের আন্দামানেই জীবনাবসান ঘটেছে।

সেলুলার জেলে ছিল মোট ৭০০ সেল বা কুঠরি। জেলটা ৭টা ওয়ার্ডে বিভক্ত। সভ্য পৃথিবী জানলে অবাক হয়ে যাবে যে, এই জেলে অত্যাচার এবং পশুর মতো ব্যবহারের জন্ম প্রতি মাসে গড়ে তিন জন কয়েদী আত্মহত্যা করেছে।

বার্মা-ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী ছিলেন রামরক্ষা। হিন্দুস্তানী গোঁড়া ব্রাহ্মণ হিসাবে তিনি পৈতা দাবি করেন। জেল-কর্তৃপক্ষ পৈতা দিতে অস্বীকার করে। তার প্রতিবাদে তিনি তিন মাস অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। মুসলমান কয়েদীদেরও নামাজের টুপি না দিয়ে ঈদের জমায়েতে উপস্থিত হতে দেওয়া হতো না—এমনি বহু ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

কয়েদীরা বছরে একখানা চিঠি লিখতে এবং বাড়ি বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাত্র একখানা করে চিঠি বছরে পড়তে পারত। খাওয়া-দাওয়া-স্নান, এমন কি মলমূত্র ত্যাগ—সব ব্যবস্থাই ছিল বর্বরতায় পরিপূর্ণ। একটা মাটির ঘটের মধ্যে মলমূত্র একসঙ্গে ত্যাগ করতে হতো।

এই সময়ে অত্যাচার-নিপীড়ন যতই হোক না কেন, বিপ্লবী-বন্দীদের যত জঘন্যভাবেই রাখা হোক না কেন, আর আন্দামান দ্বীপের সরকারী কাণ্ডকারখানাকে যত বড় যবনিকা দিয়েই ঢেকে রাখা হোক না কেন, বন্দীদের সামনে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল—যা উনিশ শতকের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠেছিল। আন্দামান-বন্দীদের সম্বন্ধে একটা সহানুভূতিও দেশের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের কয়েকজন বিপ্লবী কারামুক্তির পরে দেশে ফিরে কালাপানির রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই লেখেন, তাতে ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা-সংগ্রামের চেতনা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, অর্থাৎ বিশের এবং তিরিশের দশকে আন্দামানে যেসব বন্দীদের পাঠানো হয় তাঁদের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের বন্দীদের সঙ্গে তুলনা করলে তৃতীয় পর্যায়ের বন্দীই বলা যেতে পারে।

আমি ১৯৩৪ সালে আন্দামানে প্রেরিত হই; সুতরাং তৃতীয় পর্যায়ে পড়ি। আন্দামান এই সময়ে কালাপানি হিসাবে পরিচিত হলেও ব্যাপক বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন এবং সুসংগঠিত বিপ্লবী আঘাত-প্রত্যাঘাতের পটভূমিতে এর বিভীষিকা দেশবাসীর চেতনায় অনেকটা ফিকে এসেছে। আন্দামান-বন্দীরাও গণ-আন্দোলনের আয়ত্তের মধ্যে এসেছেন। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাঁদের স্বীকৃতি দেবার জন্য আন্দোলনও গড়ে উঠেছে এই সময়ে।

সুতরাং এই তৃতীয় পর্যায়ের আন্দামান বন্দীশালাকে বুঝতে হলে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পটভূমিকে বুঝতে হবে।

রক্তক্ষয়ী প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হলো। সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছানুযায়ী নয়, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন বারতা নিয়েই প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ হলো। দেশে-বিদেশে বিপ্লববাদীদের, সৈনিকদের, সংগ্রামী জনসাধারণের সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার, অসংখ্য কর্মীর ফাঁসি ও মৃত্যুবরণ, হাজার হাজার কর্মীর কারাযন্ত্রণা ভোগ সত্ত্বেও ভারত কিন্তু স্বাধীন হলো না। বরং, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জার্মানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে বিজয়ীর উন্মাদনায় উদ্যত ফণা নিয়ে নবজাগ্রত জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল।

ইতিমধ্যে অবশ্য মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। ১৯১৭ সালে স্বৈরাচারী জারশাসিত রুশিয়াতে বলশেভিক (কমিউনিস্ট) পার্টির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া-শাসন-

ব্যবস্থা ধ্বংস করে সোশ্যালিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হলো। গোটা মানব-সভ্যতার অগ্রগতির দিক থেকে বিচার করলে এত বড় ঘটনা ইতি-পূর্বে আর সংঘটিত হয় নি। এই মহান বিপ্লব গোটা মানব-সমাজের উপর, বিশেষ করে প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতাকামী ভারত, চীন, মিশর, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করল। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের রাজ প্রতিষ্ঠা, শ্রেণী-হীন সমাজ স্থাপন, মানুষের উপর মানুষের শোষণহীন সমাজ গঠনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, অনাগত দিনগুলোতে কমবেশি ভারতীয় রাজ-নীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যুদ্ধাবসানের পর গোটা উপমহাদেশে তখন চলছিল চরম অর্থনৈতিক সংকট। স্থানে স্থানে জনতার অসংগঠিত বিক্ষোভ। পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে যুদ্ধ-প্রত্যাগত কিছু কিছু সৈনিক এই আন্দোলনে এসে যোগ দিতে শুরু করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পাঞ্জাবের উপর চরম নিষ্পেষণ আরম্ভ করে দেয় নিষ্পেষণ আইন—অর্থাৎ, রাউলাট এ্যাক্ট অনুযায়ী তল্লাসী করা, গুলি করে হত্যা করা, রাস্তা-ঘাটে মাথা নত করে ইউনিয়ন জ্যাককে (ব্রিটিশ পতাকা) সেলাম ঠোকা প্রভৃতি দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই নৃশংস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যই চারিদিকে আবদ্ধ জালিয়ান-ওয়ালা বাগে এক সামাজিক মেলা উপলক্ষ করে মিলিত হয়েছিল নর-নারী-শিশুসহ হাজার হাজার নিরস্ত্র জনতা। চারিদিকে আবদ্ধ এই নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়াভাবে চালানো হলো ডায়ার এবং ওডায়ারের মেশিনগানের শেষ গুলিটি পর্যন্ত। নিরস্ত্র পরাধীন ভারতবাসীকে শিক্ষা দেবার জন্যই প্রদর্শিত হয়েছিল এই পশু-সুলভ আস্ফালন। এক হাজারের উপর নরনারীকে গুলি করে হত্যা করা হলো। গোটা উপমহাদেশ এই সংবাদে গুমরিয়ে

কেঁদে উঠল। রুখে দাঁড়াল গোটা ভারত। গান্ধীজী লিখলেন, "ওঠো, জাগো, ভারতবাসী মানুষ হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াও, এই শয়তানের রাজত্ব খতম করো।" তিনি গোটা ভারতে প্রতিবাদ হিসাবে একদিন হরতাল ও উপবাসের নির্দেশ দিলেন। সমগ্র পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে দেখল ৩০ কোটি ভারতবাসী এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত ব্যারিস্টার মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয় জনগণের নেতা হিসাবে বেরিয়ে এলেন।

গান্ধীজী সংস্কারবাদী, আপসপন্থী, স্বাধীনতকামী বুর্জোয়া-নেতা ছিলেন। বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা সমাজের আমূল পরিবর্তন তিনি কোনদিন চান নি। তা সত্ত্বেও সেই অন্ধকার দিনগুলিতে জনতার অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদ চেতনার মাঝে তিনি হিন্দু-মুসলমান জনতাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—"হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ভাই-ভাই হয়ে চলুন, আমরা সকলে মিলে ভারতের স্বরাজ আদায় করব।" তিনি জমিদার ও কৃষকদের, মিল মালিক ও মজুরদের পাশাপাশি বসবার কথা বলেছিলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বদাই বিরুদ্ধে। সমাজে হিংসা-দ্বেষ-যুদ্ধ কেন হয়, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই যে হিংসার উদ্ভব এই দৃষ্টিভঙ্গী তিনি কোনদিন গ্রহণ করেন নি। এইখানেই তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্টদের মৌলিক পার্থক্য। এতদসত্ত্বেও তিনিই সর্বপ্রথম একমাত্র নেতা যিনি গোটা ভারতবর্ষকে ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে পরিচালিত করে-ছিলেন। সেই গভীর আবেগে উদ্বেলিত দিনগুলিতে, জনতার রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার যুগে, তিনি হিন্দু-মুসলমান জনতাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনরক্ষা করার জন্যই স্বরাজ আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। আসুন আমরা একত্রিত হই। এক বছরের ভিতর স্বরাজ আমরা পাবই, যদি দেশবাসী ৬টি শর্ত মেনে নিয়ে সাহসের সঙ্গে অবিলম্বে সংগ্রামে অগ্রসর হয়।" এই ছয়টি শর্ত হলো :

(১) ব্রিটিশ কোর্ট-কাছারি-অফিস, স্কুল-কলেজ-ডাক্তারী সব ছেড়ে যদি আমরা ব্রিটিশের সাথে অসহযোগ করি,

(২) ব্রিটিশ পণ্য—কাপড়, মদ, প্রভৃতি বর্জন করি,

(৩) সাম্প্রদায়িকতা দূর করে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলন করি,

(৪) সুতা কাটা, খদ্দর ও দেশী কাপড় পরি,

(৫) অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্যতা দূর করে হরিজন ভাইদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করি, এবং তাঁর শেষ কথা হলো—

(৬) কর্মীদের সর্বক্ষেত্রে অহিংস থাকতে হবে। গুলি, জেল. লাঠিপেটা—শত উস্কানি সত্বেও সত্যাগ্রহীকে নিরুপদ্রব ও অহিংস থেকে কারাগারে যাবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২০-২১ সাল থেকে অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলন শুরু করে। বিপ্লববাদীদের অনেকেই এই ব্যাপক গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। "বিভক্ত রাখো ও শাসন করো,"—সাম্রাজ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্র চূর্ণ করে সকল স্তরের ও সকল শ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নেমেছিল। সেদিন প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র, অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ লোকদের উস্কানিতে জনতা আল্লাহ ও ভগবানকে কোনভাবেই পৃথক করে নি বন্দেমাতরম ও আল্লাহ আকবর একসাথে চলেছে। সেই দিনগুলিতে এক অভূতপূর্ব হৃদয়স্পর্শী হিন্দু-মুসলমান মিলনদৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের বিজ্ঞ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক প্রায় চার-পাঁচ হাজার কর্মী ও নেতা গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে "সর্বক্ষণের কর্মী" হিসেবে স্বাধীনতা না-পাওয়া পর্যন্ত বারবার কারাবরণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সেদিন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মীরাই ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের মূল শক্তি।

এই আন্দোলনে বিভিন্ন স্থানে কৃষকশ্রেণী সমষ্টিগতভাবে যোগ

দেয়। রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে কিছু কিছু কৃষক সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশগ্রহণও করে। আসামের চা-বাগানের মজুর, বোম্বে-কলকাতার মজুরশ্রেণী হরতালের মাধ্যমে ও বিভিন্ন কায়দায় এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। গান্ধীজী চম্পারনে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের দাবি নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে জয়যুক্ত হন। তিনি আহম্মদাবাদে মিল-মজুরের দাবি নিয়েও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও অনশন করে দাবি আদায় করেন। কিন্তু কৃষকের আন্দোলন যখনই বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে তখনই গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন।

তখন ভাবতে সমাজতন্ত্রের কথা, কমিউনিস্টদের কথা, কৃষক-মজুরদের সংগঠিত করার কথা কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বিদেশে অবস্থানকারী অনেক বিপ্লববাদী নেতা সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভ্য হিসেবে এম. এন. রায়, অবনী মুখার্জী, বীরেন চাটার্জী, সৌকত ওসমানী প্রভৃতি নেতারা গোপনে ভারতবর্ষে কাগজপত্র পাঠাতে শুরু করেছেন।

খেলাফত আন্দোলন তুরস্কের খলিফাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে শুরু হলেও সে-সময়ের পরিস্থিতিতে মূলত তা ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলনে পরিণত হয়। তাছাড়া নব্য তুর্কীর জন্মদাতা কামাল আতাতুর্ক মধ্যযুগীয় খলিফাতন্ত্রকে ধ্বংস করে তুরস্কের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পথে যাত্রার পথ সুগম করেন। এই ঘটনার পরে ভারতবর্ষের খেলাফত আন্দোলনে মধ্যযুগীয় খলিফাকে সমর্থন করার পরিসমাপ্তি ঘটে। বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান "খেলাফতকে উদ্ধার করব" এই সঙ্কল্প নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তাঁদের মাঝে একটা অংশ কাফেরের দেশ (অর্থাৎ ইংরেজ-শাসিত দেশ) "দারুল হরব" ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে মধ্য এশিয়ায়

হিজরত করেন। এদের মধ্যে ১২৮ জন নভেম্বর বিপ্লবের "মধ্য এশিয়ার মুসলিম ভাইসব ওঠো, জাগো—শতাব্দীর শোষণ ও জুলুম শেষ কর" ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু দুঃখ-ক্লেশ বরণ করে শেষ পর্যন্ত তাসখন্দে যেয়ে উপস্থিত হন। শোনা যায়, এঁদেরই কেউ কেউ এবং নির্বাসিত ভারতীয় বৈপ্লবিক কর্মীরা মিলে সর্বপ্রথম তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন করেন। এঁদের মধ্য থেকে অনেকেই "পূর্বদেশীয় শ্রমজীবী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে" শিক্ষা গ্রহণ করে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

অসহযোগ আর খেলাফত আন্দোলনে প্রায় ১ লক্ষ নর-নারী কারাবরণ করে। গুলি, লাঠি ও হাতির নিচে পিষে অজস্র কর্মীকে হত্যা করা হয়। জুলুমশাহী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বর্বর অত্যাচারে অনেক স্থানে কৃষকেরা অতিষ্ঠ হয়ে স্বাভাবিকভাবে শ্রেণীসংগ্রামের পথে, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসে; কোনো কোনো স্থানে থানা, পুলিশ ফাঁড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং পুলিশদের হত্যা করে। "আমি হিমালয়ের মতো ভুল করেছি, জনতা হিংসার পথে যাচ্ছে"—এই কথাগুলো ঘোষণা করে গান্ধীজী আন্দোলন তুলে নেন। কিন্তু সেই সমস্ত স্থানে চলে তখন দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার যখনই কৃষকশ্রেণী বা মজুরশ্রেণী নিজস্ব শ্রেণীসংগ্রামের কায়দায় এগিয়ে এসেছে, তখনই আপসপন্থী জাতীয় নেতা গান্ধীজী আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন। বিখ্যাত চৌরিচৌরা মামলায় কুখ্যাত ব্রিটিশ বিচারক এইচ. এল. হোম ১৭২ জন কৃষকের ফাঁসির হুকুম দেয়, এবং শত শত লোককে যাবজ্জীবন ও দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের হুকুম দেওয়া হয়।

এই সমস্ত দীর্ঘমেয়াদী বন্দীর একাংশকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত বন্দীরা কোনদিনই রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পান নি।

গোটা ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান মিলনের ভিত্তিতে গণ

আন্দোলন হলেও আপসপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব আর এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিল না। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আর এলো না। আন্দোলনে প্রবল গণজাগরণ দেখা গেলেও আন্দোলন ব্যর্থ হলো। আন্দোলন তুলে নেওয়া হলো। এই পটভূমিতে হাজার হাজার বিপ্লববাদী আবার গোপনে নতুন উদ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তিরিশ দশকের আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সময়ে পাশাপাশি তিনটি আন্দোলনের ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় মুক্তিআন্দোলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই তিনটি ধারা ভারতীয় মুক্তিআন্দোলনে কখনো কখনো মূল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা—এই উদ্দেশ্যে একসাথে কাজ করেছে, কিন্তু এই তিনটি ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গী এক ছিল না। (ক) গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দেশব্যাপী অহিংস ব্যাপক গণ-আইনঅমান্য আন্দোলন গোটা দেশকে মাতিয়ে তুলল। এক লক্ষের উপর নর-নারী কারাবরণ করল। শোলাপুর ও পেশোয়ার শহরের সংগ্রামী জনতা সশস্ত্র সংগ্রাম করে শহর দখল করে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন অত্যাচার, গুলি, পিউনিটিভ ট্যাক্স গোটা উপমহাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল।

(খ) এই সময় কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের নেতৃত্বে মজুর-কৃষকের আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমেই অনুভূত হতে শুরু করে। বোম্বেতে গিরনি কামগর ইউনিয়নের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ধর্মঘট, কলকাতায় চটকল মজুরদের ধর্মঘটের মধ্যে অনাগত সংগ্রামের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সুচতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মজুর-কৃষক আন্দোলনকে আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রথমেই আঘাত শুরু করল মজুর আন্দোলনের উপর। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট

নেতা ব্রাডলি, হাচেন্সন, স্প্র্যাট এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমদ, ঘাটে, মিরাজকর, গোপাল বসাক, জি অধিকারী, পি. সি. যোশী, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি প্রায় ৩১ জন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট নেতাকে গোটা ভারত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিশ্ববিখ্যাত মিরাট-ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব এবং মজুর ও কৃষক-শ্রেণীর আন্দোলন অতি ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে। মিরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় কমরেড মুজফ্ফর আহমদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তিন বছর জেলে থাকার পর আপিলে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ এবং তাঁর সাথীদের দণ্ড বিচারালয় কমিয়ে দেয় অথবা নাকচ হয়ে যায়।

(গ) এই সময়টাতে (১৯২৭-৩০ সাল) গোটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতেও চরম সংকট চলছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ভারতের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছিল সীমাহীন সংকট। সমগ্র ভারতে বেকার সমস্যা, অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মহামারীও প্রকটরূপে দেখা দেয়। গোটা ভারতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পরাধীনতার গ্লানি ও পশুর মত জীবনযাপন, বর্বর জুলুম ও নিষ্পেষণ, যুব-সমাজের মাঝে অবিলম্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামে এগিয়ে যাবার স্পৃহাকে শতগুণ বৃদ্ধি করে। গোটা ভারতবর্ষে বিপ্লববাদী দলগুলো কমবেশি "এবার দেশকে স্বাধীন করব অথবা মৃত্যু বরণ করব"— এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসে। বাংলা দেশে অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি ব্যক্তিগত ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পূর্বে ঝগড়াঝাটি করলেও এই দুই বিপ্লববাদী দল এই সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। "জীবন নেব ও দেব, মৃত্যু বরণ করে এবার দেশকে স্বাধীন করবই করব"— এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুবসমাজ সম্মুখ-সমরে এগিয়ে চলল। ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকড় ও শক্তি ছিল কোথায়? দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, কায়েমী স্বার্থবাদী

সামন্তবাদ এবং বড় ধনিকরাই সাম্রাজ্যবাদীশক্তিকে জিইয়ে রেখেছিল। দেশের এই কথা তখন বিপ্লববাদীরা সঠিকভাবে বুঝেছিল কিন্তু দেশের ৯৮% জনতা মজুর-কৃষক তখনো স্বতঃস্ফূর্ততার প্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জনতাকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছিল। জনগণ হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মতো জেগে আবার কিছুকাল বিশ্রামের দিকে ঝুঁকত। এই অবস্থায় বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদের দিকেই ঝোঁকে। তাদের এক আওয়াজ—"যা কিছু শক্তি আছে, যা কিছু সম্বল আছে এবং যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব তা দিয়েই শেষ লড়াই করব।" দেশপ্রেমে উন্মাদ, সাহসে অদ্বিতীয়, ব্যক্তিগত বিপ্লববাদে চরম এই সমস্ত বীরযোদ্ধারা ভয়হীন-ভাবে এগিয়ে চলল হাসতে হাসতে ফাঁসির রশির দিকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে হয় স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু, এটাই তাদের একমাত্র রণধ্বনি হলো:

এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শংকা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মূলত দুইটি শ্রেণীর, ধনিকশ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টি-ভঙ্গী স্পষ্ট প্রতিফলিত হতে শুরু করলেও প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণী তৃতীয় তথা বিপ্লববাদী পথই নিয়েছিল। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অহিংস শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হোক কিংবা সহিংস অস্ত্রের সাহায্যে হোক, এতে কিছু যায় আসে না। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূলত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। পরাধীন-তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে এটা ছিল প্রগতিশীল ধারা। বুর্জোয়ারা দেশকে স্বাধীন করে ব্রিটিশ,

আমেরিকা বা ফ্রান্সের মতো একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিল। এরা মাঝে মাঝে কখনও একদিকে কখনও অন্য আর একদিকে উৎসাহ-প্রদর্শন করে। এই ঝোঁকের একটি ছিল আপসপন্থী অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা এবং অপরটি ছিল আপসহীন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপ্লববাদীরা শেষোক্ত ধারায় সাধারণ উৎসাহকে কাজে লাগিয়েছিল, যদিও বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদের কখনও সাহায্য করে নি।

কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—জন্মভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করব, প্রতিষ্ঠা করব কৃষক-মজুরের রাজ। এদের মাঝেও বিভিন্ন গ্রুপ ও দল ছিল। সেই পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর দিনগুলোতে জনতার উপর এঁদের প্রভাব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা খুবই দুর্বল ছিল। দুনিয়া ব্যাপী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত ভারতের চরম অর্থনৈতিক সংকট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন শোষণ ও লুণ্ঠন এবং অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে দেশে ব্যাপক বিপ্লববাদী আন্দোলনের পটভূমি ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছিল। বিপ্লববাদীরা অন্য কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৪ সালে কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করা হয় এবং এরি ফলে ১লা মার্চ গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়। বাঙলাদেশের সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, ভূপতি মজুমদার, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, রমেশ আচার্য, বিপিন গাঙ্গুলী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মিত্র, গণেশ ঘোষ, প্রতুল ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি ৩০০ জন নেতাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৬ সালে কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলায় আসফাকুল্লা,

রাজেন লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন লাল ও পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিলের ফাঁসি হয় ও অন্যান্য আসামীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়; দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামী-কর্তৃক পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জীকে আলীপুর জেলে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ সেনের ফাঁসি হয় এবং ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, অনন্ত চক্রবর্তী (ভোলা দা), ও রাখাল দে-র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ১৯৩৩ সালে এঁদের বার্মা ও মহারাষ্ট্রের কারাগার থেকে আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯২৮ সালে বরিশালে অত্যাচারী পুলিশ ইনস্‌পেক্টর যতীশ দারোগাকে হত্যা করার জন্য রমেশ চ্যাটার্জীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় এবং পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়।

১৯২৭-২৮ সাল থেকেই একদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের অগ্রগতি, অপরদিকে বিপ্লববাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। এই সময় বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বন্দীরা মুক্তি পেয়েছিলেন এবং তাঁরা নতুনভাবে কাজেও নেমেছিলেন।

১৯২৮ সালে কলকাতা-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার মজুরের কংগ্রেস প্যাণ্ডেল দখল করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক গঠনের প্রস্তাব পাস করা, ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব হরতাল দ্বারা সাইমন কমিশন বয়কট, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা-লীগ সৃষ্টি, বিপ্লববাদীদের নেতৃত্বে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর স্থাপন, হরতাল উপলক্ষে লাহোরে স্কট সাহেবের নির্দয় লাঠি পেটার জন্য ভারতের বিখ্যাত নেতা লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু এবং শ্রমিক আন্দোলন ও মিরাট-ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশ ক্রমেই আন্দোলনমুখী হয়ে উঠছিল।

জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর-অধিবেশনে ঐতিহাসিক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র বসু ও

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে "স্বাধীনতা-লীগ"-এর প্রস্তাব ছিল—অবিলম্বে "বিকল্প স্বাধীন গভর্নমেন্ট" ঘোষণা করা হোক। কংগ্রেস ঠিক করে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সর্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করবে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে সর্বপ্রকার আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু করবে। ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারা গুলি লাঠি উপেক্ষা করে হাজার হাজার নরনারী প্রেস-আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে শুরু করে। গোটা দেশব্যাপী এই অভূতপূর্ব গণ-জাগরণে কায়েমী স্বার্থবাদী ও ব্রিটিশ দালাল ব্যতীত, কমবেশি সমগ্র ভারতবাসী এই আন্দোলনে সক্রিয় অথবা নীরব সমর্থন জানায়।

বাঙলাদেশে তখন প্রধানত ৪টি বিপ্লববাদী দল ছিল : (১) অনুশীলন সমিতি (২) যুগান্তর পার্টি (৩) শ্রীসংঘ বি. ভি. গ্রুপ ও (৪) সকল দলের বিদ্রোহী কর্মীদের নিয়ে গঠিত বিদ্রোহী দল। এর মাঝেও আবার ছোট ছোট গ্রুপ ছিল। বিভিন্ন বিপ্লববাদী দলগুলোর ভিতর ১৯২৯ সাল থেকেই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এই দলগুলোর ভিতর প্রধানত যুবসমাজ দাবি করে, "অবিলম্বে যা কিছু শক্তি আছে তা নিয়েই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ লড়াই লড়তে হবে।" অপরদিকে পুরনো নেতৃত্ব তখনই বিপ্লববাদী সংগ্রামে নামতে রাজী ছিলেন না। এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম কোনো কোনো জেলায় কোনো কোনো দলে দেখা যায়। যেমন, চট্টগ্রামে যুগান্তর গ্রুপের সহগামী শহীদ সূর্য সেনের দলের সকলেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ গ্রহণ করেছিল, ঠিক তেমনি ২৪ পরগণা ও কলকাতায় সাতকড়িপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই সমস্ত দলের সংগ্রামী কর্মীদের নিয়েই 'রিভোল্টিং গ্রুপ' বা 'বিদ্রোহী গ্রুপ' সৃষ্টি হয়। কলকাতা-কংগ্রেসেই এই সংগঠনের প্রাথমিক রূপরেখা জন্ম নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯২৯ সালে, কলকাতার হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে গণেশ ঘোষ (চট্টগ্রাম), প্রতুল ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ), বিনয় রায়চৌধুরী (কলকাতা), ভূপেন রক্ষিত, সত্য

গুপ্ত (ঢাকা) মুকুল সেন, শচীন করগুপ্ত, নিরঞ্জন সেন, সুধীর আইচ (বরিশাল) প্রভৃতিকে নিয়ে এই সংগঠনের আনুষ্ঠানিক সভা হয়। এখানে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো : (ক) যার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ শুরু করা, 'অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা তৈরীর মাল-মশলা সংগ্রহ করা। (খ) ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, দক্ষিণ কলকাতায় একদিনে অস্ত্রাগার দখল শুরু করা। (গ) টাকা-পয়সা প্রধানত নিজেদের বাড়িঘর ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে সংগ্রহ করা এবং পাবলিক ডাকাতি নয়, শেষ পর্যন্ত দরকার হলে সরকারী টাকা লুন্ঠন করা। [এই সংগ্রহে চট্টগ্রামে ৩০ হাজার এবং বরিশালে ২০ হাজার টাকার উর্ধ্বে উঠেছিল।]

পরবর্তী সময়ে বাঙলাদেশের অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এই রিভোল্ট গ্রুপের কর্মীরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। খুব কেন্দ্রীভূত সুশৃঙ্খল দল না হলেও এই দলগুলোর একটি শর্ত হলো, যা-কিছু শক্তি আছে তা দিয়েই অবিলম্বে ব্রিটিশকে আক্রমণ করতে হবে। তখন ভারতবর্ষে অনেক কর্মী ও দল আধা-সমাজতান্ত্রিক আধা জাতীয় বিপ্লববাদী দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কলকাতা কংগ্রেস থেকেই বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লববাদী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, নওজোয়ান ভারত সভা, কীর্তি কিষাণ পার্টি ইত্যাদি।

বিপ্লবীরা লালা লাজপত রায়ের হত্যাকারী স্কট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। ভুলক্রমে লাহোরে নিহত হয় সাণ্ডার্স সাহেব। ১৯২৯ সালে জন-নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দিল্লীর পরিষদ কক্ষে বোমা ফাটাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত। তাঁরা দৃঢ়ভাবে ভীতিহীন বিবৃতি দিয়ে গোটা ভারতবাসীকে সচকিত করলেন, "বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে

উঠেছে···আমরা শেষ বারের মতো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে দিচ্ছি মাত্র।"

উপরোক্ত ঘটনা দুটিকে কেন্দ্র করে সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, কমল তেওয়ারী, শিববর্মা, কিশোরী, লালা মহাবীর সিং, দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস এবং বিজয় সিং, জয়দেব কাপুর, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, অজয় ঘোষ, (পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক) প্রভৃতি ২৫-৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়।

জেলে অবস্থানকালে রাজনৈতিক বন্দীরা ভালো খাদ্য, পড়াশুনার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি আদায়ের জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন। যতীন দাসের দাবি ছিল, প্রথমে সরকারকে বন্দীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করতে হবে, তারপর অনশন ভঙ্গ করা হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের অধিকার আদায়ের দাবিতে যতীন দাস তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। গোটা ভারতে এই দাবির সমর্থনে গভীর বিক্ষোভ শুরু হয়। ছাত্র-জনতার হরতাল, অনশন, সভা ও মিছিল চলতে থাকে। ৬৩ দিন অনশন করে বীর যতীন দাস ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শহীদ হন। প্রায় প্রতিটি শহর ও স্টেশনে মিছিল করে লাহোর থেকে তাঁর পুষ্পাবৃত শবদেহ কলকাতা শহরে আনা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য জেল কোডের পরিবর্তন করে।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। অজয় ঘোষ ও অন্যান্য দুই একজন বন্দী মুক্তি পান। বটুকেশ্বর দত্তসহ অন্য সবাইকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯২৯ সালে বাঙলার বিপ্লববাদীদের বিদ্রোহী গ্রুপের কর্মীরা রাজসাহীর পুটিয়াতে একটি মেল ট্রেনে ডাকাতি করার চেষ্টা করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় সুশীল দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হয়। মামলার আসামী রূপে রাখাল দাস, হরেন্দ্র নাগ, ধরণী বিশ্বাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মুকুলরঞ্জন সেন ও সুরেশ দাশগুপ্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। এই মামলায় ধরণী বিশ্বাস ও সুশীল দাশগুপ্তের ৬ বছর সাজা হয় এবং এঁদেরকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় বিদ্রোহী গ্রুপের যেসব সদস্য বরিশালে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র করেছিল তারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে যায়। ময়মনসিংহ থেকে বোমা নিয়ে সুধাংশু দাশগুপ্ত (বাবু) মেছুয়াবাজারে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের বাসায় এসে উঠেছিল। 'রক্তে মোদের লেগেছে আজি সর্বনাশের নেশা'—এই ইস্তাহার খুঁজতে এসে পূর্বেই পুলিশ নিরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং সতীশ পাকড়াশীকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা সুধাংশু দাশগুপ্তকেও গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ ঐ বাসা থেকে সংকেতে লেখা একটি কাগজে ৬০ জনের নাম উদ্ধার করে। তারপর পুলিশবাহিনী এক রাত্রে বরিশালে ও কলকাতার প্রায় দেড়শত বাড়ি তল্লাসী করে। পরবর্তী সময়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ও পাটু[illegible] লেন থেকে এই মামলার পলাতক আসামী শচীন করগুপ্ত, মুকুল সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুধাংশু মজুমদার, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতিকে বোমা তৈরীর মালমশলাসহ গ্রেপ্তার করে।

এই মামলায় সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, শচীন করগুপ্ত, মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্তের ৭ বছর এবং নিশাকান্ত রায়চৌধুরী, সুধাংশু দাশগুপ্তের ৫ বছর সাজা হয়। এঁদের সকলকে আন্দামানে পাঠানো হয়। রমেন বিশ্বাসেরও ৫ বছর সাজা হয় কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয় না।

সুধীর আইচ, দেবপ্রিয় চাটার্জী, সুধাংশু মজুমদার, বিহারীলাল বিশ্বাস, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, তারাপদ গুপ্ত, সত্যব্রত সেন, রবীন্দ্রনাথ বসু,

সুবোধ চক্রবর্তী, জগদীশ চ্যাটার্জী, নির্মল দাস, কুঞ্জ বসু, কুঞ্জলাল দাশগুপ্ত, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুরেশ গাঙ্গুলী—সকলেই হয় হাইকোর্ট কিংবা ট্রাইবুন্যাল থেকে মুক্তি পেয়ে জেলের গেটে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন।

এই মামলায় ফণী দাশগুপ্ত, নলিনী দাস, শান্তি সেন, অনিল চ্যাটার্জী, কান্তি চ্যাটার্জী—এঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। মেছুয়াবাজার মামলায় গ্রেপ্তার শুরু হবার পরে বরিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এরপর বিনয় রায় চৌধুরী, প্রতুল ভট্টাচার্য, ধীরেশ গুহ, নলিনী দাস ঢাকায় যেয়ে সত্য গুপ্ত, ভবেশ নন্দী, ব্রজেন দাস, সতীন রায়, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ এবং চট্টগ্রামের গণেশ ঘোষের সাথে কথা বলে অন্যান্য জেলায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একটা তারিখ ঠিক করে। কিন্তু তা-ও কার্যকর হয় না। কারণ, মেছুয়াবাজার বোমার মামলার পর থেকে পুলিশের সতর্কতা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামে একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার দরুণ চট্টগ্রামের বন্ধুরা তাড়াতাড়ি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। একমাত্র মাস্টারদা সূর্য সেনের সুদক্ষ নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সাফল্যমণ্ডিত হয়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরেই পুলিশ বাঙলাদেশের প্রায় এক হাজার বিপ্লববাদী কর্মীকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী সময়ে ঢাকার জ্ঞান চক্রবর্তী ও অনিল মুখার্জীর সাথেও উপরোক্ত গ্রুপের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজী আরম্ভ করলেন লবণ আইন ভঙ্গ সত্যাগ্রহ। তিনি বোম্বের সমুদ্র-সৈকতে ডাণ্ডি অভিযান শুরু করলেন। সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মী লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস ও কারাযন্ত্রণা উপেক্ষা করে বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামে যোগ দিল। প্রতিদিন হাজার হাজার কর্মী

কারাগারে যেতে শুরু করল। কয়েক মাসের মধ্যেই এক লাখ নরনারী কারাগার পূর্ণ করল।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের রাত্রিতে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের নেতৃত্বে ৬০ জন মুক্তিপাগল যুবক বন্দুক, রিভলভার ও বোমা নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও লুণ্ঠন শুরু করে। সেই দিনগুলিতে প্রায় সকল বিপ্লবী কর্মীরাই কংগ্রেসের কর্মী ছিল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়, রেলওয়ে লাইন তুলে ফেলা হয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস ধ্বংস করা হয়। স্বাধীন ভারত কি জয়, ইংরেজ রাজত্ব খতম কর, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি স্লোগানের আওয়াজ ও গোলাগুলির শব্দ শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আরদালী ও অস্ত্রাগারের দুই জন অফিসার বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়। তার ড্রাইভার গুলিতে আহত হয়। সেই রাত্রিতেই শহরের সমস্ত সাহেব পরিবারগুলো পালিয়ে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহরে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা তুলে দেয় এবং সমস্ত শহরে স্বাধীন রিপাবলিকের কথা ঘোষণা করে ইস্তাহার বিলি করে।·বিভিন্ন থানার পুলিশরা হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তারা আত্মসমর্পণের কথা ভাবছিল। চট্টগ্রাম শহর তিন দিন পর্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তিন দিন পর ইস্টার্ন রাইফেল শহরে প্রবেশ করে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় অর্ধেন্দু দস্তিদার, হিমাংশু রায় সহ কয়েকজন কর্মী গুরুতর আহত হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত আহত বিপ্লবীদের রাখবার জন্য শহরে ঢোকায় প্রধান গ্রুপের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। প্রধান গ্রুপটি

দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এঁদের খাদ্য ও পানীয়ের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শহরে সংবাদ নেওয়ার জন্য অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তি মেধাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারাও আর ফিরে আসে নি।

২২ এপ্রিল জালালাবাদে এসে ব্রিটিশ সৈন্য পাহাড় ঘেরাও করে। চার দিন ধরে অনাহারে ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জীবনপণ সংগ্রাম করেন। নরেশ রায় (ময়মনসিংহ), ত্রিপুরা সেন (ঢাকা), বিধু ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), হরি বল (টেগরা), মোতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ এই সংগ্রামে নিহত হন। এঁরা সকলেই ছাত্র ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় অম্বিকা চক্রবর্তী, সূর্য সেন, নির্মল সেন এবং লোকনাথ বল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দসহ দলের অন্যান্যরা সরে যেতে সক্ষম হন।

জালালাবাদ পাহাড়ের সম্মুখ-যুদ্ধের পর কয়েকজন বিপ্লবী চট্টগ্রাম শহরে আসেন। পুলিশ সন্ধান পেয়ে তাঁদের পিছু নেয় এবং কালারপুলে এঁদের সাথে সৈন্যদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন এবং স্বদেশ রায় নিহত হন। ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত চট্টগ্রাম জেলা থেকে সরে গিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হন। কিছু দিন পরে অনন্ত সিংহ কলকাতা পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অন্যান্য বিপ্লবীরা তখন চন্দননগরে ছিলেন। এঁদের খোঁজ পেয়ে কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্টের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ১৯৩১ সালের ১ সেপ্টেম্বর চন্দননগরে বিপ্লবীদের বাড়ি

ঘেরাও করে। খণ্ডযুদ্ধে জীবন ঘোষালের মৃত্যু হয়। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলায় এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। চন্দননগরের আশ্রয়দাত্রী পুটুদি (সুহাসিনী দেবী) ও তাঁর সঙ্গী শশধর আচার্যকে রাজবন্দী করা হয়।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার দুই জন পলাতক আসামী কালিপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস চাঁদপুর স্টেশনে পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেন্ট তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করে। মামলায় এই দুই বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম হয়। কালিপদ চক্রবর্তীর বয়স কম বিবেচনা করে তাঁকে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

১৯৩১ সালের ৩০ আগস্ট গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার খান বাহাদুর আসানুল্লাকে চট্টগ্রামে ফুটবল খেলার মাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক এক যুবক হত্যা করে। এই ঘটনার পর তার উপর যে-অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল এর কোনো তুলনা হয় না। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় পিটাতে পিটাতে বারবার অজ্ঞান করে ফেলা হয়। ছেলের সম্মুখে পিতামাতাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়। বাড়ির ঘর-দুয়ার ও আম-কাঁঠালের বাগান কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। হরিপদর অল্পবয়স বলে বিচারে তাঁকে ফাঁসির হুকুম না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের বন্দীরা কারাগারের মধ্যে ডিনামাইট স্থাপন করেন। তাঁরা পিস্তল ও রিভলভার সংগ্রহ করে জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে যাবারও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই ষড়যন্ত্র সবই ধরা পড়ে যায়। ফলে কয়েকজন কর্মীর দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয় এবং

তাঁদের একজনকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। ১৯৩২ সালের ২৩ জুন পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে ধলঘাটে নবীন চক্রবর্তীর বাড়ি ঘেরাও করে। উভয়পক্ষে গুলি চলতে থাকে। এই খণ্ড-যুদ্ধের সময় ক্যাপ্টেন ক্যামারুন বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। সৈন্যদের গুলিতে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পলায়ন করতে সক্ষম হন।

১৯৩২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে ১০-১২ জন তরুণ বিপ্লবী বোমা, পিস্তল ও রিভলভার নিয়ে ইয়োরোপিয়ান ক্লাবঘর আক্রমণ করে ৫০টি শ্বেতাঙ্গ নরনারী আহত ও ভীতিগ্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে চলে যায়। প্রীতিলতা কাজ শেষ করে পথিমধ্যে আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের জীবন বিসর্জন দেন

১৯৩৩ সালের ১৬ [illegible] সৈন্য গৈরলা গ্রামে সারদা সেনের বাড়ি ঘেরাও করে সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, মণি দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইখানে খণ্ডযুদ্ধে আহত অবস্থায় সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন অন্যান্য বিপ্লবীরা পলায়ন করতে সক্ষম হন কিন্তু পরে অন্য মামলায় মণি দত্ত ও শান্তি চক্রবর্তীকে সাজা দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩৩ সালে ১৯ মে সৈন্যবাহিনী গহিরার গ্রাম ঘেরাও করে। কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি পলাতক বিপ্লবীরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন উভয় পক্ষে গুলি চলে। পুলিশের গুলিতে মনোরঞ্জন দাস, শচীন্দ্র দাস, পূর্ণ তালুকদার নিহত হন এবং কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদার আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন।

১৯৩৩ সালের ২৫ জুন ট্রাইব্যুনালের বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে মৃত্যুদণ্ড এবং কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার এই দুই মহান বিপ্লবী নেতা

নৃশংসভাবে ইংরেজদের হাতে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ১৯৩২ সালে গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে হাইকোর্ট তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলায় অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার, সরোজ গুহকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সবচেয়ে গৌরবজনক ও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। এই ঘটনা দেশপ্রেম ও দুঃসাহসিকতায় অদ্বিতীয় হলেও এটা ছিল মজুর-কৃষক-মেহনতী জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৈপ্লবিক কর্ম-প্রয়াস। কিন্তু এই বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিপ্লবী আবেগ ও দেশপ্রেমে তুলনাহীন, ত্যাগে সীমাহীন ও সাহসে কল্পনাতীত এইসব বীর-যোদ্ধারা হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে দিয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পর থেকে গোটা ভারতে, বিশেষত বাঙলাদেশের প্রতিটি জেলায়, থানায় ও গ্রামে অসংখ্য বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই ঘটনার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। অনুজা সেন (সেনহাটি, খুলনা) নিজের বোমার আঘাতে নিহত হন। দীনেশ মজুমদার (বসিরহাট) আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন এবং তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। দীনেশ মজুমদার পরে মেদিনীপুর জেল থেকে পলায়ন করেন।

২৬ ও ২৭ আগস্ট জোড়াবাগান ইডেন গার্ডেনস্থ পুলিশ ফাঁড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ-কর্তৃক কলকাতার প্রায় ১০০ বাড়িতে তল্লাসী চালানো হয়। বহু তাজা বোমা, রিভলভার, বোমার খোল এবং বোমা তৈরীর মাল-মশলা পুলিশ হস্তগত করে। এই সম্পর্কে ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বোস, অদ্বৈত দত্ত, রোহিণী অধিকারী, শোভারাণী দত্ত, কমলা দাশগুপ্ত এবং শৈলরাণী দত্ত সহ আরো ৪০ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভূপাল বসু—এঁদের প্রত্যেকের ১৫ বছর সাজা হয়, সুরেন্দ্রনাথ দত্তের হয় ১২ বছর সাজা। এঁদের সকলকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়

২৯ আগস্ট বাংলার পুলিশ ইনস্পেক্টর-জেনারেল লোম্যান ও ঢাকা জেলার পুলিশ সাহেব হডসন যখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল পরিদর্শন করছিলেন তখন বিপ্লবীবীর বিনয় বসু দুজনকেই গুলির আঘাতে ভূপাতিত করেন লোম্যান মারা যায়, হডসন অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকেন এবং বিনয় বসু পালাতে সক্ষম হন।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতা শহরে পলাতক বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত প্রধান সরকারী দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দেন এবং কারা বিভাগের ইনস্পেক্টর-জেনারেল কর্নেল সিমসনকে রিভলভারের গুলিতে হত্যা করেন তাঁদের আক্রমণে আরো কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আহত হয় বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।

১৯৩০ সালের ২৩ ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন সভায় হরিকিষণ নামক এক যুবক পাঞ্জাবের গভর্নর গোমারীর উপর উপর্যুপরি দুবার গুলি বর্ষণ করেন। এর ফলে গভর্নর ও দুজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১৯৩১ সালের ২১ জুলাই বাসুদেব বলবন্ত বোম্বের গভর্নর

গোগার্টির উপর গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বাসুদেবের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

১৯৩০ ও '৩১ সালে এইরূপ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড পুরাদমে চলছিল। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজী ও ভারতের গভর্ণর জেনারেল আরউইনের ভিতর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে কংগ্রেসের প্রায় ১ লক্ষ আইন অমান্যকারী বন্দী মুক্তি পায়। কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত ও বিনাবিচারে আটক বিপ্লববাদী বন্দীরা এই সময় মুক্তির আলো দেখতে পান না।

১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবীনেতা চন্দ্রশেখর আজাদকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশের সাথে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। চন্দ্রশেখর পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে গেলে আত্মহত্যা করেন।

১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্নেল পেডি একজন বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়। বিমল দাশগুপ্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়।

আলিপুর কোর্টের দায়রা জজ গার্লিক দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই রিভলভারের গুলিতে কোর্টে তাকে হত্যা করা হয়। হত্যা করার পর বিপ্লবী যুবকটি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর জামার পকেটে নাম পাওয়া যায় বিমল দাশগুপ্ত। পুলিশ পেডি হত্যার জন্য বিমল দাশগুপ্তকে খুঁজছিল। এই যুবকটির আসল নাম ছিল কানাই ভট্টাচার্য (২৭ পরগণা) কিন্তু পুলিশ তিন বছর খুঁজেও তাঁর আসল নাম বের করতে পারে নি।

১৯৩১ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতার ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলি করে বিমল দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হন। তাঁকে দশ বৎসর সাজা দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-শিবিরে বিনাবিচারে রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানো হয়। ফলে কলকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারকেশ্বর সেনগুপ্ত (গৈলা) নিহত হন। বহু রাজবন্দী গুরুতরভাবে আহত হন।

২৮ অক্টোবর ঢাকা শহরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে গুলি করা হয়। সেই ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতর আহত হয়ে বিলাতে চলে যায়। আক্রমণকারী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পলাতক আসামী সরোজ গুহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এরপর ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার গ্রাসবীকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করা হয়। বিনয় রায় ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩১ সালের ২১ আগস্ট ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার এ. কে সেলের উপর রিভলভার দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্সকে ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অষ্টম ও নবম শ্রেণীর দুই বালিকা, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী গুলি করে হত্যা করে। এদের দু জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশুশেখর পাল মিঃ ডগলাসকে রিভলভার দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করেন। ফাঁসির পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে প্রদ্যোৎ বলেছিলেন, "আমি প্রস্তুত, তুমিও প্রস্তুত হও।" বিচারে প্রদ্যোতের ফাঁসি হয় এবং পুলিশ প্রভাংশুর কোনো খোঁজ পায় নি।

মেদিনপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জ ১৯৩২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। অনাথবন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকজন বন্ধুসহ বার্জ সাহেবকে খেলার মাঠে আক্রমণ করে এবং তাকে নিহত করে। আর, অনাথবন্ধু পাঞ্জা ও

মৃগেন্দ্র দত্ত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অপর সাথীরা পলায়ন করেন। ঐ মামলায় ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় এবং নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসি হয়। কামাখ্যা ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, শান্তি সেন, সনাতন রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন।

এলাহাবাদে যশপালকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁর খণ্ডযুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই গুলি চলে। আহত যশপাল ধরা পড়েন এবং বিচারে যশপালের ১৪ বছর কারাদণ্ড হয়।

১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বীণা দাস (ভৌমিক) সমাবর্তন উৎসবে বাঙলার লাট স্যার স্টেনলি জ্যাকসনকে বিভলভার দিয়ে আক্রমণ করেন। জ্যাকসন অল্পের জন্য রক্ষা পান। বীণা দাসকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ১৮ জুন কালিপদ মুখার্জী নামে একটি যুবক বিক্রমপুরের অত্যাচারী পুলিশ অফিসার কামাখ্যা সেনকে নিদ্রিতাবস্থায় গুলি করে হত্যা করেন। "কাজ শেষ করেছি"—এই কথা জানিয়ে একটি টেলিগ্রাফ পাঠাতে গিয়ে কালিপদ গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ২১ জুলাই কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ই. বি. ইবসন বিপ্লবীদের গুলিতে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এই সময় বাঙলার নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের প্রায় ঘরে ঘরে চলছিল গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণাবদ্ধের হিড়িক। ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরি, ক্লাব, কুস্তির আখড়া, ফুটবল টিম—সর্বত্রই চলছিল পুলিশের অবাধ অভিযান। গভর্নর এণ্ডারসনের শ্বেতসন্ত্রাসের রাজত্বে বাঙলার বুকে নেমে এসেছিল এক অমানুষিক অত্যাচারের কালোছায়া। ছাত্র-যুবকদের মাঝে যারা কথা বলতে পারে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে, বুক ফুলিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করে—তাদেরই

গ্রেপ্তার করা হতো। দেশপ্রেমিক, সাহসী সমাজকর্মী কোনো ছেলেরই বাইরে থাকার উপায় ছিল না। সরকারী চাকুরিয়াদেরও দণ্ড দিতে হতো—নিজের এবং ছেলেমেয়ের জন্য। পিতা হয়ে পুত্রকে পুলিশের নিকট ধরিয়ে দেওয়া, ভাই হয়ে ভাইকে ধরিয়ে দেওয়া, এমনি অমানুষিক ঘটনাও তখন বাঙলাদেশে বেশ কিছু ঘটেছে।

প্রধানত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও ঢাকাতেই চলছিল তখন চরম বর্বর নিষ্পেষণের তাণ্ডবলীলা। মেয়েদের উপর বলাৎকার করা কিংবা ঘর-বাড়ি-গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া কোনো বিরল ঘটনা ছিল না। মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যবাদী দালাল ও চরেরা দেশব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও শুরু করে দিত। ইনস্পেক্টর জেনারেল লোম্যান খুনের পর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেস নেতা ও বিপ্লববাদীদের বাড়িঘর এবং ছাত্রদের হোস্টেল লুটপাট করা হয়। চট্টগ্রামে গোয়েন্দা পুলিশ ইনস্পেক্টর আসানুল্লার মৃত্যুর পরেও কংগ্রেস নেতা এবং বিপ্লব-বাদীদের বাড়িঘর লুট করা হয়। এই দুই স্থানেই ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার জন্য বার বার চেষ্টা করা হয়।

মাদারিপুরের চরমুগরিয়ায় একটি মেল ডাকাতিতে গ্রাম্য চৌকিদার ও সাধারণ লোকদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুজনের মৃত্যু হয়। ঐ মামলায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। সুরেন কর ও যজ্ঞেশ্বর দাসকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং যোগেশ চাটার্জিকে ১০ বছর সাজা দিয়ে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনের উপর গুলি ও বোমা নিয়ে আক্রমণ করা হয়। ওয়াটসন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লিখেছিলেন, "...এই সমস্ত সন্ত্রাস-বাদী কর্মী ও নেতাদের জেল ও ক্যাম্প থেকে বের করে এনে লাইট পোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হোক।" ওয়াটসন অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। অতুল সেন (খুলনা) নামক এক যুবক গ্রেপ্তারের পূর্বে

আত্মহত্যা করেন।

ঐ বছর ২৮ সেপ্টেম্বর ওয়াটসনের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ পরিচালিত হয়। রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে তিনটি যুবক তার উপর গুলি চালায় ও বোমা ফেলে। এই আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে মণি লাহিড়ী ও অনিল ভাদুড়ী আত্মহত্যা করেন। বীরেন রায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ওয়াট্‌সন গুলিতে চলংশক্তিহীন হয়ে পড়েন কিন্তু তখনই মারা যান নি। এই মামলায় সুনীল চ্যাটার্জীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং প্রমোদ বসুর ৭ বছর সাজা হয়। এঁদের আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩২ সালে চন্দননগরে দেয়াল-বেষ্টিত একটি বাড়িতে পলাতক বিপ্লবীদের দিনের বেলায় ঘেরাও করা হয়। বিপ্লবীরা গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসেন। ৫/৬ মাইল রাস্তায় ও বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে পুলিশ কমিশনার কিউ সাহেব বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয় এবং কয়েকজন পুলিশ গুরুতররূপে আহত হয়। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলাতক বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার এবং হিজলী ক্যাম্প থেকে পলাতক বিপ্লবী নলিনী দাস পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বীরেন রায়কে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৩২ সালের ১৮ নভেম্বর রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলের অত্যাচারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ. ডানার্ড লিউকের মোটর থামিয়ে বিপ্লবীরা তাকে গুলি করেন। লিউক মারাত্মকভাবে আহত হয়। এই মামলায় ভোলানাথ কর্মকার বলে একটি যুবককে ১০ বছর সাজা দিয়ে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩৪ সালের ৭ জানুয়ারি চট্টগ্রামের ক্রিকেট খেলার মাঠে পুলিশ সুপার টেলরের উপর আক্রমণ করা হয়। বোমার আঘাতে কিছু লোক আহত হয়। ঘটনাস্থলেই টেলরের গুলিতে দুজন বিপ্লবী নিহত হয়। এঁদের একজনের নাম হলো নিত্য চৌধুরী। এই

মামলায় ২ জন বিপ্লবীর ফাঁসি হয়। এই ২ জনের নাম হলো কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী।

১৯৩৩ সালের জুন মাসে কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে একটি ৪ তলা বাড়িতে দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীকে পুলিশ ঘেরাও করে। সেখানে উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলে। ডি. এস. পি পোলার্ড ও ডি. আই. বি ইনস্‌পেক্টর মুকুন্দ ভট্টাচার্য গুরুতর আহত হয়। শেষ গুলি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর সাংঘাতিক আহত অবস্থায় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয় এবং অন্য দু-জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়।

১৯৩৩-৩৪ সালে ৩৮ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন" ষড়যন্ত্র-মামলা রুজু করা হয়। এই মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুরেন ধরচৌধুরী, পরেশচন্দ্র গুহ ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র, অবনীমোহন ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, হরিপদ দে, প্রফুল্ল সান্যাল, অমূল্যচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার পালকে ৭ বছর—হেম ভট্টাচার্য, বিমল ভট্টাচার্য, জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদারকে ৬ বছর—সুধীর ভট্টাচার্যকে ৫ বছর—১০ জনকে তিন বছর এবং ৭ জনকে ১ বছর সাজা দেওয়া হয়। ৫ বছরের ওপরে সাজাপ্রাপ্ত প্রায় সকল বন্দীকেই আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

১৯৩৪ সালে টিটাগড়ের একটি বাড়ি তল্লাসী করে পুলিশ বোমা তৈরির মালমশলা ও আগ্নেয়াস্ত্র পায়। ঐ বাড়িতে পুলিশ পারুল মুখার্জী, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং শ্যামবিনোদ পালকে গ্রেপ্তার করে। এই মামলায় পূর্ণানন্দের যাবজ্জীবন ও প্রফুল্ল সেনের ১৪ বছর

দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শ্যামবিনোদের ১০ বছর সাজা হয়। দেব-প্রসাদ সেনগুপ্তের ৭ বছর সাজা হয়। ধীরেন মুখার্জী, কার্তিকচন্দ্র সেনাপতি, জগদীশ চক্রবর্তী, শান্তি সেনের ৫ বছর সাজা হয়। জীবন ধুপী, বিভূতি ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, জগদীশ ঘটকের ৪ বছর সাজা এবং অন্যান্য আরো ৪ জনের ৩ বছর সাজা হয়। কিন্তু এই মামলার অধিকাংশকেই আন্দামানে পাঠানো সম্ভব হয় নি।

১৯৩৪ সালের ৮ মে দার্জিলিং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ লিবং-এ কুখ্যাত গভর্নর এণ্ডারসনের উপর গুলি করা হয়। এই মামলায় ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির হুকুম হয় আর কুমারী উজ্জ্বলা মজুমদার মধু ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি ও লাল্টু ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। শেষোক্ত তিন জনকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

রোহিণী বড়ুয়া ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার আবুরখিল গ্রামের নীলকণ্ঠ মহাজনের সন্তান। অন্তরীণাবস্থায় গ্রামবাসীর প্রতি স্থানীয় দারোগার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে রোহিণী সেই দারোগাকে হত্যা করেন। এই অভিযোগে ১৯৩৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর রোহিণী বড়ুয়ার ফাঁসি হয়।

জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল এবং সেই সময় পাঞ্জাবের গভর্নর ছিল মাইকেল ও ডায়ার। ওধর্ম সিং নামক এক পাঞ্জাবী যুবক এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিলেতে গমন করেন এবং এই দুই পশুকে হত্যা করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলেন। ফাঁসির পূর্বে ওধর্ম সিং বলেছিলেন, "অত্যাচারীর সঠিক সাজা দিতে পেরেছি এই আমার আনন্দ।" লণ্ডনে ১৯৪০ সনের ১২ জুন ওধর্ম সিং-এর ফাঁসি হয়।

১৯৩১ সালে হিজলী ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন ফণী দাশগুপ্ত ও নলিনী দাস। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলায়ন করেন দীনেশ মজুমদার, শচীন করগুপ্ত, সুশীল দাশগুপ্ত।

১৯৩৩ সালে বক্সা ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন জীতেন গুপ্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। ১৯৩৩ সালে বহরমপুর ক্যাম্প থেকে পলায়ন করেন ধীরেন দাস ও নিরঞ্জন মুখার্জী। আর ১৯৩৪ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পলায়ন করেন পূর্ণানন্দ দাস, নিরঞ্জন ঘোষাল, সতীনাথ দে ও হরিপদ দে।

সরকার এই সমস্ত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য মোটা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

অতি সংক্ষেপে এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড এবং নামকরা কয়েকটি মামলার উল্লেখ করা হলো। সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে এই সমস্ত বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস এতই গুরুত্ব-পূর্ণ যে, তার প্রত্যেকটি নিয়েই এক-একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে এবং হয়ত অনেক হয়েছেও। এমন জেলা নেই, এমন থানা নেই যেখানে বিপ্লববাদীরা কিছু-না-কিছু কাজ করেছেন। কারণ, বিপ্লববাদীরা সকলেই ছিলেন জনতার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। আজ আমার স্মরণশক্তির অক্ষমতার জন্য ছোট-বড় অনেক ঘটনা অনিচ্ছা-কৃতভাবে বাদ পড়েছে। এছাড়া ছিল জেলায় জেলায় ষড়যন্ত্র মামলা, সরকারী বে-সরকারী এবং পোস্ট অফিসের টাকা লুণ্ঠন; ছোট-বড় ডাকাতি, অস্ত্র-শস্ত্র, রিভলভার, বোমা, বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ নিয়ে গ্রেপ্তার; অনেক পুলিশ, পুলিশের গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক ও আই. বি. খুন বা খুনের প্রচেষ্টা।

ষড়যন্ত্র মামলার ভিতর দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা, মেছুয়াবাজার বোমার মামলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-মামলা, ওয়াটসন হত্যার ষড়যন্ত্র-মামলা, বীরভূম ষড়যন্ত্র-মামলা, সিলেট ষড়যন্ত্র-মামলা, রংপুর ষড়যন্ত্র-মামলা, হিলি ট্রেন ডাকাতি মামলা, মেদিনীপুর বার্জ হত্যার ষড়যন্ত্র-মামলা, ময়মনসিংহ ষড়যন্ত্র-মামলা, টিটাগড় ষড়যন্ত্র-মামলা, নারায়ণপুর (বরিশাল) বোমার মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র-মামলা, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট গুলির

মামলা এবং লিবং ষড়যন্ত্র-মামলা প্রসিদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশপ্রেমের আবেগ ও উন্মাদনায় বিভোর বিপ্লববাদীরা এগিয়ে চলছিল মৃত্যুর মুখোমুখি, স্বাধীনতার লড়াইয়ে। কোনো যুক্তি, বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তব জীবন, মজুর-কৃষক, অধিকাংশ জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন—এই সব চিন্তা করার সুযোগ তাঁদের ছিল না। তাঁদের একমাত্র চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ছিল ব্রিটিশ-রাজ শেষ করতে হবে, জন্মভূমি ভারতকে স্বাধীন ও মুক্ত করতে হবে।

"ওরা সকলে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।
চরণে দলে গেল মরণ শঙ্কারে।"

এই সমস্ত মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিলেন, ফাঁসি আর গুলিতে না মরে দীর্ঘমেয়াদী সাজা পেয়েছিলেন, তাঁদেরই আন্দামানে পাঠানো হয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কমবেশী যুক্ত থেকেও যাঁদের কোনো সাজা হয়নি তাঁরা ছিলেন ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেলে বিনাবিচারে বন্দী।

ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশন ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের চাপে ১৯৩১ সালেই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই সমস্ত দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের আন্দামানে পাঠিয়ে জীবন শেষ করে দিতে হবে। কলকাতার ইয়োরোপিয়ান এসোসিয়েশনে এই প্রস্তাবও উঠেছিল যে, বিপ্লবীদের এই রক্তবীজের বংশ ধ্বংস করার জন্য শুধু বন্দীদের নয়, তাদের বাবা-মা এবং পরিবারবর্গকেও আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হউক। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র প্রতিবাদ ওঠার জন্য ব্রিটিশ সরকার ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাস থেকে বিপ্লববাদীদের আন্দা-মানে পাঠানো শুরু হয়।

আন্দামানের ভৌগোলিক ঐতিহাসিক পরিচয়

এইসব মৃত্যুভয়হীন আবেগ-উদ্দীপ্ত আন্দামান রাজবন্দীদের দুঃখ ও আনন্দে ভরা দিনগুলোর কথা আলোচনা করার পূর্বে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালা বঙ্গোপসাগরের ৯২° ডিগ্রী ৪৫ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ও ১১° ডিগ্রী ৪৩ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। প্রায় ১ হাজার ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে এই দ্বীপ-মালা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত। এর আয়তন ১৭৪৩ বর্গ মাইল। কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ৬০০ মাইলের মতো। বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদদের মতে এই দ্বীপপুঞ্জ অতীতে এশিয়া মহাদেশের সাথে যুক্ত ছিল। নৈসর্গিক উত্থান-পতন ও সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে এটি স্থল ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিণামে একটি অপরটি থেকে আলাদা হতে হতে শত শত ক্ষুদ্র দ্বীপে রূপান্তরিত হয়। দ্বীপগুলো সবই পর্বতময়। এখানে সমভূমি নেই বললেই চলে। এই দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে মাউন্ট হেরিয়েটই সর্বোচ্চ পাহাড়।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্রই নোনা পানি। খাবার পানি পাবার কোনো প্রাকৃতিক ব্যবস্থাও আন্দামানে নেই। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে উঁচু টিলা থেকে ঝর্না প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তা শুকিয়ে যায়। কূপ ও দিঘির সংখ্যা প্রচুর। এই স্থানগুলোতে বর্ষার পানি ধরে রাখা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যখন খাবার

পানির অভাব হয় তখন কলকাতা, রেঙ্গুন ও মাদ্রাজ থেকে জাহাজে করে খাবার পানি আনা হয়।

দ্বীপগুলো বন-জঙ্গলে ভর্তি। এখানে কাঠের মস্ত বড় ব্যবসা। জঙ্গলে শূকর ছাড়া আর কোনো হিংস্র প্রাণী নেই। পূর্বে বছরে প্রায় ৯ মাসই বৃষ্টি হতো, এখন জঙ্গল পরিষ্কার করার পর বৃষ্টি অনেক কমে গেছে। শীত না থাকার জন্য শীতের দিনের তরকারি মোটেই হয় না। অধুনা জঙ্গল পরিষ্কার করে শত শত গ্রাম গড়ে উঠেছে। পূর্ব বাঙলার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বাড়িঘর করে এখন আন্দামানে বসবাস করছে। এখানে গম ও ধানের চাষ হয়।

এই দ্বীপগুলোর আসল অধিবাসী হলো আদিম মানুষ। আদিম যুগের মানুষ এখনো এখানে জঙ্গলে বসবাস করে। এরা সকলেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উলঙ্গ। শহরের কাছাকাছি বা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা কেউ কেউ নেংটি, প্যাণ্ট বা গাছের ছাল ব্যবহার করে। এদের ভিতর এখনো লেখ্য ভাষার প্রচলন নেই। আল্লাহ্ বা ভগবান বলে কোনো অশরীরী শক্তিকে এরা এখনো সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রকৃতির কোলে—সমুদ্র, নোনাপানি, পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝে এদের জন্ম। এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই এরা বড় হয়েছে। ধর্ম, রাষ্ট্র, সম্পত্তি, জটিলতা, কুটিলতা এদের মাঝে গড়ে উঠে নি। গোষ্ঠীবদ্ধ বন্যজীবনই এরা যাপন করে। এদের মাঝে এখন শিক্ষা বিস্তারের কিছু কিছু চেষ্টা হচ্ছে। আদিম অধিবাসীদের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট। হাবসীদের মতোই এদের রং কালো। মাথা গোলাকার, চোখ বড় বড় আর মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো চুল। এরা খুব শক্তিশালী ও পরিশ্রমী। পুলিশ এদের দুই-এক জনকে ধরে নিয়ে এসেছে জেলে, তখনই আমরা এদের দেখেছি।

লেফটেন্যাণ্ট ব্লেয়ার নামে ব্রিটিশ জাহাজের এক কাপ্তেন সর্বপ্রথম আন্দামানে জাহাজ নোঙ্গর করেছিল। তার নামানুসারেই

এই দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার নামকরণ হয়েছে। এই দ্বীপে প্রথম যখন জাহাজ আসে তখন আদিম অধিবাসীরা ভয় ও আতঙ্কে তীর-ধনুক নিয়ে সেই জাহাজকে আক্রমণ করেছিল। ধনতান্ত্রিক বন্দুকের মুখে, তথাকথিত সভ্যতার নিকট, ক্রমেই তীর-ধনুকের আদিম সভ্যতা পরাজিত হতে বাধ্য হলো। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার কয়েদীদের আন্দামানে বসবাস করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তখনকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না বলে ঐ ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালে প্রথম আজাদি সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সরকার পুনরায় এখানে কয়েদী বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। সেই সময়ে আদিম অধিবাসীরা পুনরায় বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে এবং তারা হেভ্ব ও আবারদিন দ্বীপের উপর আক্রমণ চালায়। একদিকে বন্দুক-কামান, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এবং অপরদিকে আদিম অস্ত্র তীর-ধনুক। স্বাভাবিকভাবে আদিম অধিবাসীরা পরাজিত হয়। এই সময় ব্রিটিশ কূটনীতির দ্বারাও আদিম অধিবাসীদের ব্রিটিশ সরকারের বশীভূত করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশের একছত্র আধিপত্য ছিল। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা কিছু দিনের জন্য এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নিয়েছিল।

ত্রিশ দশকের বিপ্লববাদী রাজবন্দীরাই আন্দামানে সর্বশেষ কিছুটা সংগঠিত রাজনৈতিক বন্দী। আন্দামান ও ভারতব্যাপী রাজবন্দীদের ঐতিহাসিক আমরণ অনশন ধর্মঘট এবং দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি এই রাজবন্দীদের সর্বশেষ ব্যাচকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করে।

গোটা পাক-ভারতে তখন চলেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী বিরাট গণ-আন্দোলন। চলেছে জীবন দেওয়া ও নেওয়ার পালা, বিপ্লববাদী আন্দোলন। গান্ধীজীর রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে

যেয়ে স্বরাজ পাবার আশা তখন ব্যর্থ হয়ে গেছে। অহিংস আন্দোলনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চূর্ণ করা ও শাসকগোষ্ঠীর মনের পরিবর্তন আনা তো দূরের কথা, ব্রিটিশ সরকারই এবার প্রথম থেকে সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে ভারতীয় জনগণের উপর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গান্ধীজীর জাহাজ বোম্বে বন্দরে পৌঁছাবার পূর্বেই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, খান আবদুল গফুর খান ও সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ; স্থানে স্থানে আইন-অমান্য আন্দোলন ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে গেছে। গান্ধীজীকে জাহাজ থেকে নামবার সাথে সাথেই গ্রেপ্তার করা হলো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হলো। অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারী করে পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলো। একদিন একরাত্রে প্রায় ২৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হলো। সামান্য আন্দোলনও শুরু হবার পূর্বে কিংবা সাথে সাথে সেই আন্দোলনকে চরম নৃশংস নিষ্পেষণের দ্বারা গলা টিপে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হলো।

অহিংসপন্থী ও নিরুপদ্রব গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহীদের দশা যদি এইরূপ হয় তাহলে তখন সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের দশা কোথায় যেয়ে পৌঁছেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তখন দেশে চলেছে একটানা সীমাহীন জুলুম। সে এক অকল্পনীয় অব্যক্ত নৃশংসতা ও পশুত্ব। বাইরে ও কারাগারে সর্বত্রই এক চিত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচার সমস্ত দেশে চরম আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টি করেছে। প্রায় ১ লক্ষ রাজনৈতিক বন্দী তখন পাক-ভারত উপমহাদেশের কারাগারে রয়েছে এবং শত শত কর্মী পলাতক জীবন কাটাচ্ছে।

এই অবস্থার মাঝেই অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সিদ্ধান্ত নিল যে, বিপ্লববাদী বন্দীদের আন্দামান পাঠাতে হবে। তাঁদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হলো—সেখানে বন্দীদের পাঠিয়ে পশুর মতো অমানুষিক অত্যাচার করে তিলে তিলে এইসব বন্দীদের হত্যা করা।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে প্রথম ব্যাচকে আন্দামানে পাঠানো শুরু হয়। যাদের মামলা শেষ হয়ে গেছে এবং ৫ বছরের উপর যারা সাজা পেয়েছে, সরকার প্রথমে তাদেরই পাঠাতে শুরু করে। কয়েক দিনের মধ্যেই ৪/৫টি ব্যাচকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম ব্যাচগুলোতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন, মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র-মামলা, পুটিয়া মেল রাবারি, লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল দারোগা হত্যা-মামলা, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলা, মাদারিপুর ডাকলুট মামলা, বরিশাল ও ঢাকা ডাকলুট মামলা, পাবনা-ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল-সিঙ্গিয়া ডাকাতি-মামলা ও অস্ত্রআইনের সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদেরই পাঠানো হয়েছিল।

প্রথম ব্যাচে পাঠানো হয়েছিল : (১) গণেশ ঘোষ (২) অনন্ত সিং (৩) লোকনাথ বল (৪) কালিপদ চক্রবর্তী (৫) লালমোহন সেন (৬) সুখেন্দু দস্তিদার (৭) রণধীর দাশগুপ্ত (৮) সুবোধ চৌধুরী (৯) সুবোধ রায় (১০) ফণী নন্দী (১১) হরিপদ ভট্টাচার্য (১২) সহায়রাম দাস (১৩) ফকির সেন (১৪) মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৫) মনোরঞ্জন গুহ (১৬) বীরেন রায় (১৭) সুরেশ দাস (১৮) নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১৯) বিমল দাশগুপ্ত (২০) রমেশ চ্যাটার্জী (২১) প্রবীর গোস্বামী (২২) সুশীল দাশগুপ্ত ও (২৩) প্রবোধ রায়কে।

বন্দীরা যাতে পালাতে না পারে সর্বদিক থেকে সেই সাবধানতা অবলম্বন করে এবং জেলখানা, রাস্তাঘাট সর্বত্র ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের আন্দামানে পাঠানো শুরু করে। এক একটি ব্যাচে ২০ থেকে ২৫ জন করে বন্দী ছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই সন্ত্রাসী সাবধানতার নমুনা দেখে সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, আন্দামানে নিয়ে যেয়ে বন্দীদের উপর অকথ্য

নিষ্পেষণ চালিয়ে তাদের হত্যা করা হবে। সংগ্রামের প্রথম দফায় পরাজিত বিপ্লবী রাজবন্দীদের সে এক চরম পরীক্ষা। বিভিন্ন বন্ধুর মুখে, বিশেষ করে মুকুল দা, খোকা দা ও সুখেন্দু দস্তিদারের মুখে সেই সময়ের অবস্থাটা শুনেছি।

বন্দীদের আন্দামানে পাঠাবার সময় আলীপুর আর প্রেসিডেন্সী জেল থেকে জাহাজ ঘাট (কয়লা ঘাট) পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় ট্রাম আর অন্যান্য যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। হাতে হাতকড়া, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি, চলার সাথে সাথে ঝনঝন শব্দ করে বাজতো সেগুলি। ডাণ্ডাবেড়িগুলো ৩/৪ সের ওজনের লোহার বেড়ি। দুর্ধর্ষ কয়েদীদের ঐ বেড়ি পরিয়ে রাখে—হাঁটতে গেলে বেড়ির টানে একবার ১০-১২ আঙ্গুলের বেশি যেতে পারে না। বিশেষ সাজা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো বছরের পর বছর ঐ বেড়ি বন্দীদের পরিয়ে রাখা হয়।

কয়েদীদের আন্দামানে পাঠাবার জন্য দুটো জাহাজ 'মহারাজ' আর 'সাজাহান'—একটার পর একটা যাতায়াত করতো। এই জাহাজের ভিতরে কয়েদীদের রাখার জন্য সেল কিংবা পৃথক কোঠা ছিল। তবে ব্রিটিশ সরকার রাজবন্দীদের যত ভয়ই দেখাক. যত অত্যাচারই করুক. রাজবন্দীরা কিন্তু বেপরোয়া; ড্যাম কেয়ার ভাব। হাসি-ঠাট্টা. কবিতা-গান ও শ্লোগানে মশগুল রাজবন্দীদের মনে তখন বাজতো ঃ

শিকল পরা ছল মোদের
এই শিকল পরা ছল
শিকল পরেই শিকল তোদের
করব রে বিকল।

রাস্তাঘাটে তো বটেই সমুদ্র-পথেও সর্বত্র শ্লোগান—'বন্দে মাতরম', 'স্বাধীন ভারত কী জয়.' 'ব্রিটিশ-রাজ ধ্বংস হউক' ইত্যাদি। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল জল আর জল। তার মাঝেই

রাজবন্দীদের উল্লাস, আনন্দ আর ভয়হীন উন্মাদনা।

সমুদ্রে ঝড়-তুফান না থাকলে আন্দামানে ৪ দিনেই পৌঁছে যায় জাহাজ। রস ও এভারডিন দূর হতে দেখতে কী সুন্দর! সারি সারি নারকেল গাছ, যেন শ্যামলী বাঙলাদেশ! বন্ধুরা গান ধরতো:

'আমার সোনার বাঙলা

আমি তোমায় ভালবাসি'…

কালাপানি অর্থে জলরাশি পার হয়ে আন্দামান দ্বীপ। এর সর্বত্র নিস্তব্ধ প্রাণহীন পাথর আর চারিদিকে অথৈ সমুদ্র। তার মাঝে পাহাড়, তার মাঝে জেল। বন্দীদের নিয়ে প্রথম ঢোকানো হয়েছিল পোর্টব্লেয়ার সেলুলার জেলে। ৭০০ সেল বা ছোট কোঠা দিয়ে তৈরী এই সেলুলার জেল।

প্রথমে একসাথে দাঁড় করিয়ে বন্দীদের নাম ডাকা হতো। এক ইংরেজ অফিসার ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে সামনে এসে জিজ্ঞাসা করতো: **Do you know English?** তোমরা কি ইংরেজী জান? হয়তো উত্তর হতো: **Yes**—"হঁ্যা"। এর পরই শাসক সাহেব বলে উঠতেন: **Remember, it is not Bengal. It is Andamans. Lions are tamed here.** অর্থাৎ, মনে রেখো এটা বাঙলাদেশ নয়, এটা আন্দামান, এখানে সিংহকে পোষ মানানো হয়।

পরবর্তী হুকুম হতো: 'সেলে নিয়ে যাও'। তারপর কামারশালায় নিয়ে গিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি কাটা হতো। বন্দীদের আগমনে রাস্তায় বা জেলখানায় সর্বত্র কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হতো। রাস্তায় কোনো লোক চলতো না। সে এক গভীর নীরবতা। সর্বত্র জুড়ে থাকত এক ভয়ঙ্কর থমথমে ভাব।

৩ নম্বর ওয়ার্ডে ডিভিশন টু আর ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ডিভিশন থ্রী বন্দীদের রাখা হয়েছিল। ক্রমেই বন্দীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এইভাবেই গুলজার হয়ে উঠলো আন্দামানের আদিম মানুষের বাসভূমি আর আমাদের নরকযন্ত্রণার বন্দীশালা।

দুর্জয় প্রতিরোধ

সত্যিই এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন আন্দামানের রাজবন্দীরা। তাদের বরাতে জুটতো হাফ্ রুটি হাফ্ ভাত। অর্ধেক রুটি ও অর্ধেক ভাতই খেতে হবে। অখাদ্য তরকারী, মুখে দেওয়া যায় না। অর্ধসিদ্ধ অড়হরের ডাল। মাঠ থেকে ঘাস আর জংগল কেটে মেসিনে তরকারী তৈরী করা হয়েছে। খাট, বাতি, বিছানা, বালিশ—এর কোনটিরই বালাই ছিল না বন্দীদের জীবনে। তাদের একমাত্র সম্বল—দুটো কম্বল। বড় বড় বিছু আর চেলা রাত হলেই বিছানায় এসে উঠো বসতো। অনেককে কামড়িয়েছেও।

ডিভিশন 'টু' বন্দীরা ভারতবর্ষে ভোরে চা-রুটি, দুপুরে মাছ-মাংস, ডিম বা দুধ, এর একটা পেত। রাত্রেও এইরূপ খাওয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখানে ভোরে বরাদ্দ ছিল ছোট্ট একখানা টোস্ট। মাছ নেই বললেই চলে। কোনো দিন মাংস এক টুকরো। জেলের কাপড়-জামা ডিভিশন 'টু' বন্দীদেরও ধুয়ে নিতে হতো।

ডিভিশন 'টু' বন্দীদের এমনি দশা হলে ডিভিশন 'থ্রী'-র জীবন কী ছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। অধিকাংশ বন্দীরাই ছিল ডিভিশন 'থ্রী'।

প্রতিদিন খাবার খাওয়ার সময় মনে হতো বন্দীরা প্রত্যেকেই

যেন বিষ পান করছে। অনেকেরই রক্তআমাশা ও জ্বর হতে শুরু করল। এই অবস্থায় কারো পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। দিনের পর দিন বন্দীদের অবস্থা চরমে উঠতে শুরু করল।

এঁদের কাজ হলো ছোবড়ার দড়ি পাকানো। প্রতিদিন ২ পাউণ্ড করে প্রত্যেক বন্দীকে দড়ি তৈরী করে দিতে হবে। ঐ দড়ি আবার মাটি আর জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

দিনের বেলায় ৫টার সময় আলোহীন সেলে বন্ধ থাকতে হতো বন্দীদের ; তারপর ভোর ৫টায় খোলা হতো সেল। পত্র-পত্রিকা-বই বা রাত্রে লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত দিন কাজ, আর দুর্গন্ধ অন্ধকার কুঠরিতে ১২ ঘণ্টা বন্ধ।

রাজবন্দীদের বুঝতে এতটুকু বাকি রইলো না যে, তাঁদের তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, মানুষের মতো মরেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে—একমাত্র এই পথই বাঁচার পথ।

করিডরের মধ্যে কাজের সময় বন্ধুদের সাথে দেখা হতো এবং এই ফাঁকে কিছু কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

বন্ধুরা পরামর্শ করে আন্দামান-নিকোবরের চিফ কমিশনারের কাছে চরমপত্র হিসাবে দরখাস্ত পাঠাল। জেল-কোড, অর্থাৎ জেল-আইনের ভিতর সীমাবদ্ধ রেখেই ৩টি দাবি করা হলো। যথা : (১) ভালো খাদ্য (২) আলো (৩) পত্রিকা ও লেখাপড়ার সুযোগ। এই সব সুযোগ ভারতীয় জেলের বন্দীরাও পেয়ে থাকে। কিন্তু চিফ কমিশনারের উত্তর এলো—লাল কালিতে বড় হরফে লেখা '**NO**' ; অর্থাৎ, বন্দীরা কিছুই পাবে না।

বিপ্লবী বন্দীরা বেপরোয়া হয়ে উঠল। তারা এই চরম সিদ্ধান্ত নিল যে, ১৯৩৩ সালের মে মাসের মধ্যে বন্দীদের দাবি না-মানা হলে তিন দিন পর পর তারা বিভিন্ন ব্যাচে আমরণ অনশন শুরু

করবে। এই সিদ্ধান্ত চীফ কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হলো। ৭ দিনের ভিতর সমস্ত রাজবন্দীরা একে একে অনশনে যোগ দিল। ব্যতিক্রম দেখা দিল চট্টগ্রাম গ্রুপের ভিতর। তাঁদের মাঝে প্রধানত নেতৃস্থানীয় বন্ধুরা কৌশলের প্রশ্নে একমত হতে না পেরে অনশনে যোগ দিলেন না। তাঁদের যুক্তি হলো—অনশনের কৌশল বিপ্লবীদের নয়। সরকারের বিরুদ্ধে বাইরে সংগ্রাম করেছি—জেলের ভিতর সংগ্রাম করতে হলে মিউটিনি বা বিদ্রোহ করব। কৌশল যে বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভরশীল ও পরিবর্তনশীল, এই শিক্ষা সমস্ত বন্ধুকেই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করতে হয়েছে। সেদিন কয়েকজন অনশন না করায় রাজবন্দীদের মধ্যে বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

যাহোক, চিফ কমিশনার চরম দরখাস্তের উপর লিখে দিলেন ঃ **"I shall not budge an inch".—C. Commissioner.** "আমি সামান্যতম দাবিও মানব না"—চিফ কমিশনার। অধিকাংশ বড় অফিসার ছিল বিলেত থেকে আসা সাহেব। এর মধ্যে একমাত্র জেলারই একটু উদার ছিল। জানা গেল চীফ কমিশনার তাকে বলেছে ঃ **"Let their dead bodies be floating on the occean".**—"বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসতে দাও।"

বাঙলাদেশ থেকে টাকা-পয়সা যা কিছু গোপনে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল তা দিয়ে ভারতে সংবাদ পাঠানো শুরু হলো। তখন বাঙলাদেশে চলছে এণ্ডারসনী শ্বেতসন্ত্রাসের যুগ। কংগ্রেসী আন্দোলন ও বিপ্লববাদী আন্দোলনে তখন ভাটার টান পড়েছে। তৎসত্ত্বেও মানুষ হিসাবে বাঁচতে গেলে তখন অনশন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

অতঃপর আমরণ অনশন শুরু হলো। প্রথম দিকে সকালে ও বিকালে সেলগুলো খুলে দিত। স্নান করার সময় সেলের বাইরেও যেতে দিত। অনশনের প্রথম দিনেই জামা-কাপড়, এমন কি

ডিভিশন 'টু'-র টুথ-ব্রাশ ও টুথ-পাউডার পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হলো। সকলকেই জাঙ্গিয়া ও কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হলো। প্রচুর জল খাওয়া ও স্নান করার সুযোগ থাকার জন্য অনশনকারী বন্ধুরা প্রথম কয়েকদিন ভালোই ছিল।

পাঁচ-ছয় দিন পরেই শরীরে চরম দুর্বলতা দেখা দিতে শুরু করল। ৭ দিনের দিন বিকাল থেকেই জোর করে নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা শুরু হলো। রাজবন্দীরা কিছুতেই খাবে না, কিন্তু সরকারের প্রচেষ্টা হলো জোর করে খাবার পেটে ঢুকিয়ে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা।

সে এক পৈশাচিক কাণ্ড। অনশন চলাকালে যমদূতের মতো কয়েকজন পাঠান, পাঞ্জাবী ও বাঙালী জোয়ান-কয়েদী কালো পোশাক পরে প্রত্যেক সেলের সম্মুখে এসে উপস্থিত হতো। তখনও বাঙলা, রেঙ্গুন আর মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার এবং কমপাউণ্ডার এসে পৌঁছায় নি। জেলের ছোট ডাক্তার সঙ্গত রায় এবং কমপাউণ্ডার চকরকান্দী একমাত্র সম্বল। শোনা যায়, সঙ্গত রায় আন্দামানের এক কয়েদীর ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করার পর সরকারই তাকে কোনোরকম সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। কমপাউণ্ডার চকরকান্দী এই জেলেই যাবজ্জীবন সাজা খেটেছে এবং বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে কাজ করে কমপাউণ্ডারী শিখেছে। মুক্তির পর সে সেলুলার জেল-হাসপাতালের কমপাউণ্ডার হয়েছে। এই ডাক্তার ও কমপাউণ্ডার জোর-জবরদস্তি করে রাজবন্দীদের নাকের ছিদ্রনালীর ভিতর পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করল। যমদূত জোয়ানরা বন্দীকে চিৎ করে ফেলে, পাঁচ-ছয় জন জোর করে হাত-পা-মাথা চেপে বসে থাকে, খাটের সাথে হাত-পা বেঁধে দেয়; তখন ডাক্তার নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ বা অন্য কিছু তরল পদার্থ পেটে দেবার ব্যবস্থা করে। খাওয়ানো শেষ হলেই দুর্বল আর পরিশ্রান্ত বন্দীকে ফেলে রেখে তারা চলে যায়।

এ-এক পাশবিক ব্যবস্থা। সন্ধ্যার সময় প্রথমে সেল থেকে সেলে কিছু কানা-ঘুষা, তারপর সেল হতে সেলে চিৎকার করে সংবাদ আদান-প্রদান চললো। জানা গেল, তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন : (১) মহাবীর সিং (লাহোর-ষড়যন্ত্র-মামলা), (২) মোহিত মিত্র, (অস্ত্র-আইন-মামলা), (৩) মোহন দাস (ময়মনসিংহ-ষড়যন্ত্র-মামলা)। তিনজনেরই ফুসফুসে দুধ গিয়েছে। এর অর্থ যে মৃত্যু তা বন্দীদের জানা আছে। এরপর সেলে-আবদ্ধ বন্দীদের মনের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সাত দিনের দিন, জোর করে খাওয়াবার ঠিক প্রথম দিনেই মহাবীর সিং-এর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যুর সংবাদ বন্দীরা জানে না। ১২ দিনের দিন মারা যায় মোহিত। ১৩ দিনের দিন সকাল বেলায় মারা গেল মোহন। হাসপাতালের কয়েদী-ফালতুরা এবং একজন সিপাহী গোপনে এই সংবাদ সরবরাহ করল। ওরা আরও জানাল যে, মৃতদেহগুলোকে পাথর-বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ১৩ দিনের দিন এই সংবাদ বন্দীদের কাছে পৌঁছাবার সাথে সাথেই বন্দীরা সব আগুন হয়ে উঠল। চিৎকার শুরু হয়ে গেল : কত মৃত্যু চায় পশু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা দেখে নিতে হবে। শ্লোগান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় জমাদার ও সিপাহী কেউ আর বন্দীদের নিকটে আসে না। স্নান করাবার জন্য করিডরে আনা হয়েছিল বন্দীদের। বন্দীরা ঘোষণা করল : সঠিক সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তারা সেলে বন্ধ হবে না, লক-আপ রিফিউজ করা হলো। জেলকোডে একে বলে জেল-মিউটিনি।

খবর চাই, সঠিক খবর চাই। মহাবীর, মোহন, মোহিত জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, স্বাধীন ভারত কি জয়! শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল বন্দীশালা। বিরাট বিরাট চেহারার পাঠান, পাঞ্জাবী, বাঙালী, ও বেলুচকে বাইরের থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে; রেগুলেশন লাঠি হাতে তাদের ৪/৫ জনকে প্রত্যেক সেলের নিকট

এনে দাঁড় করানো হলো। তারপর হুকুম হলো—যাও, সেলে যাও।

বন্দীদের দৃঢ় জবাব: না, যাবো না। সংবাদ, সঠিক সংবাদ চাই। বীরবন্দীরা ধরে নিয়েছে এই তাদের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত। রাত্রি বাড়তে লাগল। বন্দীরা এতটুকু বিচলিত নয়। রাত ১০টায় জেলার সাহেব এলেন। জেলার সাহেব আমাদের নারায়ণদা ও নিরঞ্জনদাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বললে, দুঃখের বিষয় মোহন, মোহিত ও মহাবীর—তিনজনই মারা গেছে।

সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ঐ ওয়ার্ড থেকে এক নম্বর ওয়ার্ডের সেলের দোতলায় সকলকে নিয়ে যাওয়া হলো। বন্দীদের মুখে কোনো কথা নেই। নীরব প্রতিজ্ঞার মাঝে শুধু অশ্রুই ঝরছে। এরপর থেকে অনশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর সেল খোলে নি। ২৪ ঘণ্টা সেল বন্ধ। এই আবদ্ধ অবস্থায় সেল থেকে সেলে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হলো—আরও বেশিদিন টিকে থাকতে হবে, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বন্ধুরা গান ধরল:

নাই নাই ভয়
হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার।

দিন এগিয়ে চললো। কারাগারে অনশন একটা কষ্টদায়ক সংগ্রাম। রাত্রে ঘুম নেই। কেবল খাবারের স্বপ্ন। খাবার না পেয়ে ক্ষুধার্ত পেট যেন মাংস ও হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে। এক এক করে ৪০ দিন পার হয়ে গেল। সবাই অসুস্থ, সবাই ফ্লাট, একদম দুর্বল হয়ে পড়েছে। সকলেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

অনশন ধর্মঘটের ৪০ দিনের দিন এলেন কর্নেল বেকার (পাঞ্জাবের জেল-ইনস্পেক্টর জেনারেল)। অনশন-বিশেষজ্ঞ বলে সরকার তাকে পাঠিয়েছে। মূল দাবি ছিল ৩টি। যথা: আলো, ভালো খাদ্য আর পত্র-পত্রিকা। এই ৩টি দাবি পূর্ণ না হলে কোনো কথা নেই।

বিহারের সিংহ যোগেন স্কুল বেকার সাহেবকে বললো, তিনটি দাবি—"শালে দেগো কি নেহি, ইয়ে বাতাও।"

ইতিমধ্যে সামান্য সংবাদ পাওয়া গেল, শ্বেতসন্ত্রাসের মাঝেও বাঙলাদেশে কিছু কিছু আন্দোলন শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকার চাপে গভর্নমেণ্ট বাধ্য হয়ে বন্দীদের মৃত্যু-সংবাদ স্বীকার করেছে। অসুখে মরেছে বলে গভর্নমেণ্ট মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ছাত্ররা কিছু কিছু আন্দোলন শুরু করেছে।

শোনা গেল, ভারত থেকে অসংখ্য টেলিগ্রাফ এসেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বন্দীদের নিকট টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে জানিয়েছেন ঃ

"বাঙলাদেশ বাঙলার ফুলগুলোকে শুকিয়ে যেতে দিতে পারে না। অনুরোধ, তোমরা অনশন ভঙ্গ কর।"... কিন্তু ঝানু আমলা বেকার সাহেবের কথা হলো, "তোমরা বিনা শর্তে অনশন ভঙ্গ করো। তোমাদের দাবি গভর্নমেণ্ট বিবেচনা করবেন।"

বন্দীদের দাবি হলো সর্বপ্রথম বন্দীদের এক সঙ্গে বসে আলোচনা করার সুযোগ দিতে হবে। চিফ কমিশনার এই দাবি মানতে রাজী নয়।

নরপশু বেকার সাহেব বন্দীদের মাথা নত করাবার জন্য জল বন্ধ করে দিল। ৪৩ দিন তখন পার হয়ে গেছে। সেলে জল রাখার কলসীর ভিতর ওরা দুধ রেখে দিতে শুরু করলো। নরপশুরা ভাবলো, জলের তৃষ্ণায় বন্দীরা সেই দুধ খেতে বাধ্য হবে। অনেক বন্দী কলসী ভেঙে তার ভিতর প্রস্রাব করে রাখলো। এরপর কারা-কর্তৃপক্ষ বাটিতে দুধ রেখে দিত এবং সকালে তা নিয়ে যেতো।

অল্পবয়স্ক বন্ধুদের কেউ কেউ সেই অসহনীয় অবস্থায় চিৎকার করে বলেছিল, "আজ জল না খেলে মরে যাব—জল না পেলে আজ দুধই খাব।" জলের অভাবে সকল বন্দী অসম্ভব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। জল খাওয়া অনশনের নিয়মের ভিতরই রয়েছে।

একটু জল চাই—জল। জলের জন্য সেদিন বন্দী-বন্ধুদের কী

মর্মান্তিক আকুলতা! অথচ চারিদিকে সমুদ্রের জল। সেলে বসে যে-দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেদিকেই জলের অফুরন্ত সমুদ্র: মাথার উপরেও আঝোরে ঝরছে বৃষ্টির জল। কিন্তু সেলে এক ফোঁটাও জল নেই। মৃত্যুর বিভীষিকা চারিদিক থেকে সকলকে যেন গ্রাস করতে আসছে।

নিঝুম গভীর রাত্রি। নিরন্ধ্র অন্ধকার। জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। স্বল্প জল খাচ্ছেন অনশনব্রতীরা। সর্বদিক থেকে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যেন ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ চিৎকার উঠল, নিরঞ্জনদা সেলে নেই। সব বন্দী জেগে উঠল। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' রণধ্বনিতে সেলুলার জেল কাঁপতে লাগল। ভীষণ গোলমাল। বন্দীদের দাবি: "জেলারকে বোলাও, আমরা জানতে চাই—কোথায় নিরঞ্জনদা"। রাত ২টার সময় জেলার সাহেব এলো। নারায়ণদাকে বললো: 'Do not worry'—'চিন্তা করো না। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কোলাপ্‌স হয়ে যাচ্ছিল।' অনেকের অবস্থাই সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, সকলেই মৃত্যুর দ্বারে।

জল-বন্ধের তৃতীয় দিনে প্রধান মেডিকেল অফিসার (C.M.O) এলো। একটানা ৪৩ দিন অনশনের পর জলের অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় বন্দীরা তখন সত্যি সত্যি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত। ক্রোধ, ঘৃণা ও মরুভূমির সীমাহীন তৃষ্ণা সকলকে যেন আরো দুঃসাহসিক করে তুলেছে।

মেডিকেল অফিসার কালীদার (চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম) সেলের নিকটে আসার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, "জল দেবে কিনা শুনতে চাই"। অফিসার কোনো কথা না বলে পিশাচের মতো ঠোঁট ফাঁক করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কালীদা দুধের বাটিটা তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারেন। জামা-প্যান্টে দুধ ছড়িয়ে পড়ে। সাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে হুকুম দেয়; "অবিলম্বে হাতকড়া লাগাও"। যমদূতরা সাথেই ছিল। হাতকড়া লাগাবার সাথে

সাথে চিৎ করে ফেলে জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হলো। তারা পাইপ দিয়ে জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দিল দুধ নয়, জোলাপ—ক্যাস্টর অয়েল। হিটলার-মুসোলিনির ফ্যাসিস্ত বর্বরতাকেও সেদিন হার মানিয়েছিল পশু ব্রিটিশ আমলারা।

জল বিহীন ৪র্থ দিনে ওজন (Weight) নিতে এলো জেল-হাসপাতালের লোকেরা। অনশনব্রতীদের ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। জেল-কর্তৃপক্ষ এবার একটু চিন্তিত হলো। হুকুম হলো—বন্দীদের ২ আউন্স করে খাবার জল দাও। মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের মাথা নত করতে না পেরে গভর্নমেণ্টের অনশনভঙ্গকারী বিশেষজ্ঞ বেকার সাহেব তার কাজ মধ্যপথে শেষ করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলো।

বেকার সাহেবের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হলো, অনশনকারীদের ইচ্ছামত জল খেতে দাও।

আবার নতুন অবস্থার সম্মুখীন হলো রাজবন্দীরা। ইতিমধ্যে অনশনের ৪৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জেলার সাহেব এসে নারায়ণদার কানে কানে বললো, "Do not worry"—"চিন্তা করো না, চিফ কমিশনার বলেছে, সে নিজেই মীমাংসা করবে। মীমাংসার সমস্ত প্রশংসা সেই পেতে চায়। বেকার সাহেবকে এই প্রশংসার সুযোগ দিতে সে ইচ্ছুক নয়। ভারত ও বাঙলা গভর্নমেণ্ট চাইছে অবিলম্বে মীমাংসা। তোমরা অনশন ভঙ্গ কর। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমরা সব পাবে।"

রাত্রিতে মেডিকেল অফিসার এলো। চিফ কমিশনারের দূত হিসাবে সে বললো, 'you will get everything more than that...., 'তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়েও বেশি পাবে। তবে একটা কাজ করতে হবে—আগে অনশন তুলে নিতে হবে। এটাই ভারত গভর্নমেণ্ট চায়।'

পরের দিন ভোরবেলা আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে

হবে। একজন একজন করে বন্দীকে স্ট্রেচারে তুলে সেল থেকে আনা হলো। যেসব বন্দীকে অনশনের সময় বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাঁদেরও নিয়ে আসা হলো।

জেলার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এম. ও, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার—চার সাহেব উপস্থিত হলো। সব বড় বড় অফিসারের একই প্রতিশ্রুতি, তোমরা সব পাবে। অনশন ভঙ্গের জন্যে সরবত তৈরী হচ্ছে। অনেকের হাতে সরবতের গ্লাস তুলে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার চিৎকার করে উঠল, "Remember, it is unconditional surrender।" আবার নতুন অবস্থা। বন্দীরা সরবতের গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিল। এম. ও. এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারকে টেনে নিয়ে গেল। বন্দীদের বললো, তোমরা চিন্তা করো না, সব পাবে। জেলার ও জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাকে সমর্থন জানাল।

হঠাৎ ঝুনো ব্রিটিশ আমলার প্রেস্টিজের আঁতে ঘা লেগেছিল। সিদ্ধান্ত হলো, যে-প্রতিশ্রুতি আমরা অফিসারদের নিকট থেকে পেয়েছি তার ভিত্তিতে কোনো পূর্বশর্ত আরোপ না করেই অনশন ভঙ্গ করা হবে।

ইতিমধ্যে বাঙলার এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে শ্বেতসন্ত্রাসের মাঝেও বন্দীদের সমর্থনে কিছুটা গণ-আন্দোলন, বিভিন্ন মহল থেকে বাঙলা ও ভারত গভর্নমেণ্টের উপর চাপ, তিন জন বীর দেশ-প্রেমিকের অনশনে জীবনাবসান এবং অনশনব্রতীদের দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত অনশনে জয় এনে দিল।

তিন বন্ধুকে হারিয়ে আন্দামান রাজবন্দীরা এই অনশনের পর থেকেই একটি একটি করে সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করল। প্রথম দিকে নিজের পয়সায় আলো রাখার সুযোগ পেল। বই-পত্র সংগ্রহ করে পড়ার ধুম পড়ে গেল। মাঝে মাঝে সমুদ্রে মাছ ধরা পড়লে যথেষ্ট মাছ রাজবন্দীদের দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হলো। জেল-কোড অনুযায়ী শক্ত তরকারী আলু, পিঁয়াজ, যা এতদিন রাজবন্দীদের

দেওয়া হয় নি তা ভারত থেকে আনিয়ে বন্দীদের দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সেলে সেলে বৈদ্যুতিক আলো দেবার জন্য কাজ শুরু হয়ে গেল। তখনও ডিভিশন II এবং ডিভিশন III-র কিচেন পৃথক, ওয়ার্ডও পৃথক। সমস্ত দিন ওয়ার্ডে থাকতে হবে, ২ পাউণ্ড করে দড়ি পাকাতে হবে। তবে বেলা ৫টার পর থেকেই প্রতিদিন একটা ওয়ার্ডে খেলাধূলা ও বেড়াবার জন্য সকলে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল।

আলীপুর জেল থেকে আন্দামান যাত্রা

দুঃখ ও বেদনায়, বীরত্বে ও দেশপ্রেমে অতুলনীয় ১৯৩৩ সাল শেষ হয়ে গেল। অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুমের একটানা বারতা নিয়ে এলো নতুন বছর, ১৯৩৪ সাল। গোটা উপমহাদেশের বুকের উপর নেমে এসেছে চরম নিষ্পেষণের অন্ধকার কালো ছায়া। শত শত শহীদের হাসি মুখে মৃত্যুবরণ, আর লাখো মানুষের কারাবরণ সত্ত্বেও আন্দোলনে ভাটার টান পড়েছে। আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। রাজবন্দীদের মনে বিরাট জিজ্ঞাসা, নতুন পথসন্ধানের তাগিদ। সেই তমসাচ্ছন্ন দিনগুলোতে কারাগারের মাঝে রাজবন্দীদের উপর ও বাইরের জীবনে জনতার উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের কোনো সীমারেখা ছিল না। গোটা বাঙলায় তখন শ্বেতসন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে; চলছে এণ্ডারসনী অন্ধকার যুগ। পুলিশের ও দালালের নৃশংস অত্যাচারে বাঙলাদেশের যুবসমাজের হাসি ও আনন্দ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাঙলাদেশে ২৫ হাজারের উপর নারী-পুরুষ বন্দীদশায় কারাগারে দিন অতিবাহিত করছে।

আলীপুর জেলেও অত্যাচারের কোনো সীমারেখা ছিল না। তখন আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এক হাজারের মতো রাজনৈতিক বন্দী (সাজাপ্রাপ্ত) রয়েছে। এর মধ্যে আবার দুটো ভাগ রয়েছে।

(ক) জাতীয় বিপ্লবীদলের কর্মী—যারা সরকারী কর্মচারী হত্যা,

বোমা, রিভলভার, ষড়যন্ত্র, সশস্ত্র সংঘর্ষ প্রভৃতি মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড থেকে তিন বছর পর্যন্ত সাজা খাটছে, এদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত হবে।

(খ) অপর দিকে কংগ্রেসেব আইন-অমান্য আন্দোলনের বন্দী হবে প্রায় পাঁচ শত। এঁদের সাজা বেশি নয়—২ মাস, ৪ মাস, ২ বছর। ১০/১২ জন ব্যতীত এই এক হাজার রাজনৈতিক বন্দীর আর সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী, অর্থাৎ চোর-ডাকাতের মতোই তারা ব্যবহার পেয়ে থাকে।

অমর বীরশহীদ যতীন দাসের ৬৩ দিন আমরণ অনশনে লাহোর জেলে মৃত্যুবরণের পর ব্রিটিশ সরকার গণ-আন্দোলনের চাপে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সমস্ত রাজবন্দীকে ২য় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতিলিপি পশু ব্রিটিশ সরকার বহুদিন পূর্বেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

আলীপুর জেলে সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত চাল বন্দীদের খেতে দেওয়া হতো, আলো-বাতাসহীন জেলে ও কবুতরের বাসার মতো খোপে আবদ্ধ করে রাখা হতো বন্দীদের। পড়াশুনা করার জন্য বই, খাতাপত্র, পত্রিকা কিছুই দেওয়া হতো না। জেল-কোডের আইনে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের টাকায় বন্দীদের সেলে মশারী ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। বালিশ তো দূরের কথা, দুটো দুর্গন্ধযুক্ত কম্বল ব্যতীত বন্দীদের কোনো চাদরও দেওয়া হতো না। জেল-আইনে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা যতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তা থেকেও রাজবন্দীদের বঞ্চিত করা হতো। সে এক পশুর মতো জীবনযাপন—ভালো চাল, পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা, ঘরের আলো, বিছানার চাদর, এই অতি সামান্য দাবি নিয়েই আলীপুর জেলের রাজবন্দীরা অনশন শুরু করে। প্রথমে ব্যাচে ৭ জন অনশনে যোগ দেয়। ক্রমে ক্রমে সকল রাজবন্দীই অনশনে সামিল হয়। বাইরে সেই সময়কার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভায় এই অনশন

নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খিদিরপুরের শ্রমিক-সভায় বন্দীদের দাবির সমর্থনে প্রস্তাব পাস হয়। শেষপর্যন্ত জেল-কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আজ আর সঠিক তারিখ মনে নেই। খুব সম্ভব ১৯৩৪ সালের মে মাস হবে। ১৫ দিনের জীবন-মরণ অনশন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে একদিন পূর্বে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়েছি। শরীর খুবই দুর্বল, হাঁটা-চলা করতে কষ্ট হয়। অতি ভোরে জমাদার এসে হাঁক দিল, সবাইকে কাজে যেতে হবে। হাজার হাজার কয়েদীর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীরাও চলেছে গামছা. টুপি. কোর্তা গায়ে—সারি বেঁধে ফাইল দিয়ে সরকারী ছাপাখানায় কাজ করতে। অনশনের পর এই প্রথম আমাদের কাজে যাওয়া। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তখন আলীপুর জেলে বন্দী। তিনি বোম-ইয়ার্ডের পাশে ম্যাজিস্ট্রেট সেল হতে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের নমস্কার জানালেন। আমরাও তাঁকে প্রতিনমস্কার জানালুম। তিনি ও ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য জেল-কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিয়েছিলেন। রাস্তায় হঠাৎ বড় জমাদার এসে আমাকে বললো, "আপনাকে জেলার সাহেব ডেকেছেন।" আমাকে একদম কেসটেবিলে (যেখানে বন্দীদের দৈনন্দিন বিচার হয়) নিয়ে জেলার সাহেব হুকুম দিলো—একে ডাণ্ডাবেড়ি পরাও। পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি, হাতে হাতকড়া, মাজায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চললো জেল গেটের দিকে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি—কোথায় যাচ্ছি? সাহেবের এক উত্তর : 'I know nothing.—আমি কিছুই জানি না!'

জেল গেটে আমি জেল সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের সাথে দেখা করতে চাইলুম। তখন মেজর পাটনী—আই. এম. এস, আলীপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট। অমানুষিক নির্যাতনের সেই দুর্দিনেও রাজবন্দীদের সাথে ব্যবহারে তিনি কিছুটা ভদ্রতা ও যুক্তির মধ্যে থাকতে চেষ্ট

করতেন। অনশনের প্রথম দিনেই আমাকে অন্যান্য বন্ধুদের নিকট থেকে পৃথক করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় (Segregated) সেলের মধ্যে রাখা হয়েছিল। ইনস্পেক্টর জেনারেল ক্লয়ার ডিউকের সঙ্গে বারবার কথাবার্তা হয়েছে। তাই আশা ছিল তার কাছে হয়তো সত্য কথাটা জানতে পারব। একদিন পূর্বেও তিনি আমাকে অনশনে মৃত্যু-পথযাত্রী জান-খালাসের আসামী মুকুলদার সাথে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, "সরকারী জরুরী অর্ডার, আমাদের কিছু করার নেই—তোমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হচ্ছে।" আমি বললাম, "অন্তত আমাদের একই মামলার ফাঁসির আসামী দীনেশ মজুমদারের সাথে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হোক। উত্তর হলো : "আমাকে ক্ষমা করো।"

জেল গেটে কয়েদী-গাড়ী, সিপাহী, অফিসার, আই. বি.—সবাই প্রস্তুত হয়ে ছিল। একজন ডেপুটি জেলার কানে কানে বললো, "আপনার মামলা আর হবে না। খুব সম্ভব আপনাকে আন্দামানে পাঠাচ্ছে।"

আলীপুর জেল থেকে প্রেসিডেন্সি জেল খুবই নিকটে। এক জেলে পাগলাঘন্টি বাজলে অপর জেল থেকে শোনা যায়। চার মাস আগেও আমি এই জেলের ফাঁসির ডিগ্রীতে তিন বন্ধুর সঙ্গে পাশাপাশি দিন কাটিয়েছি।

জেল গেটে পৌঁছাবার সাথে সাথে পুরনো পরিচিত জেলার রায়ন সাহেব এসে বললে : "স্বাগতম, চিন্তা করো না, আমি আসছি"।

সেই পুরাতন স্মৃতিমাখা ফাঁসির ডিগ্রী ৪৪ নং সেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। কানাইলাল, গোপীনাথ প্রভৃতি কত শহীদই না এই সেলে শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে। এই প্রেসিডেন্সি জেলে এখনও শত শত রাজবন্দী (ডেটিনিউ) রয়েছে। কয়েক বছর আগে এই জেলের ৭ খাতায় আমিও ছিলাম। ভাবছিলুম, আজো হয়ত

নয়নাঞ্জনদা, সুধীরদা, রবি, অধীর, মনোজদা, কৃষ্ণদা—এমনি শত শত বন্ধুরা এই জেলেই রয়েছে।

একটু পরেই 'সরকার সেলাম' হাঁক শুনে বুঝলুম জেলার এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম : 'কি ব্যাপার? আমাকে হঠাৎ আনা হলো কেন?' রায়ন সাহেব বললো : 'চিন্তার কোনো কারণ নেই, ফাঁসি আর হবে না। আগামীকাল তুমি আন্দামানে যাচ্ছ। সরকার তোমার বিরুদ্ধে আর মামলা চালাবে না।'
আমি পুরনো ডেটিনিউ, শিক্ষিত মানুষ—আমাকে কেন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করেছে, রায়ন সাহেব তা বুঝতে পারে না।

'দেখা যাক আমি একবার চেষ্টা করে দেখব'—এই বলে জেলার চলে গেল। বিচিত্র এই মানুষের চিন্তাধারা, মনোবৃত্তি ও মানসিক মূল্যবোধ। অত্যাচার ও জুলুম রায়ন সাহেব কম করে নি। প্রেসিডেন্সি জেলে বহু বছর ধরে পাগল। জেলার বলেই পরিচিত এই রায়ন সাহেব। তার নির্দেশে কয়েদীকে নৃশংসভাবে পেটাতে পেটাতে হত্যা করতেও দেখেছি। এই জেলের বড় জমাদার ফতে বাহাদুর সিংহের তো কথাই ছিল—কাক ও কয়েদী একই চিজ। কাক মরে গেলে যেমন কেউ খোঁজ নেয় না, তেমনি কয়েদী মরলেও কৈ নেহি পুঁছতা। কিন্তু কখনো কখনো এই নির্দয় জেলারের মধ্যেও একটা অচেনা মানুষকে উঁকি মারতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাদের মামলার রায় বের হবার ঠিক পূর্ব দিন বিকালে রায়ন সাহেব আমাদের সেলে এলো। তার ধারণা ছিল তিন জনেরই ফাঁসি হবে, ২ জন সম্পর্কে সে ছিল একেবারেই নিশ্চিত।

"আগামী কাল তো তোমরা আমার জেল থেকে চলে যাচ্ছ, কি খাবে, কি চাই বল।" বুঝলুম, জেলার শেষ বিদায় দিতে এসেছে।

ভীম নাগের সন্দেশ এক কৌটো, ৫৫৫ সিগারেট, একখানা গডরেজ সাবান—আমাদের আলোচনার পর এই ফরমাইজ হলো। ২ ঘণ্টার ভিতর এই সব জিনিস এসে গেলো। সাধারণ কয়েদীদের

মাঝে পূজা বা ঈদের দিন রাত্রে তাকে টিনের পর টিন সিগারেট বিলি করতেও দেখেছি, দেখেছি বড় দিনে কয়েদীদের সঙ্গে এক-সাথে খেলাধূলা করতে।

বেলা তিনটার সময় আমার ডাণ্ডাবেড়ি খুলে দেওয়া হলো। ৪টার সময় সিপাহী এসে আমাকে গেটে নিয়ে গেল। দেখি, দাদা আর ছোট ভাই-এর সাথে মোলাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ আগেই টেলিগ্রাফ করে এদের আনিয়ে রেখেছিল। ছোট ভাই তো হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করল। দাদা শান্তভাবে বললেন, 'আমাদের খুবই ইচ্ছা ছিল তোমায় ডাক্তারী পড়তে বিদেশে পাঠানো হবে, গণক ঠাকুর বলেছিল, তোমার সমুদ্র যাত্রা আছে।' আমি বললাম, "সমুদ্র যাত্রাই তো হচ্ছে।" দাদা বললেন, 'ফাঁসি যে হলো না এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। বেঁচে থাকলে আমরা আবার তোমায় দেখতে পাব।'

এদের কী আর সান্ত্বনা দেবো! শুধু বললাম, "দেশের মুক্তির জন্য এমনি কত শত শত ছেলেমেয়েকেই তো জীবন দিতে হচ্ছে। আরও দিতে হবে। তোমাদের একটি ভাইকে না হয় দিলে।" চোখের জলের ভিতর দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

আবার ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে সেলে ঢুকানো হলো। খুব ভোরেই দেখি ডাণ্ডাবেড়ি কাটার জন্য সিপাই ও মেট এসে উপস্থিত। এর কারণ তারা কিছুই বলতে পারল না। সর্বদাই দেখেছি, চারিপাশে ফুসফুস, গুজগুজ, একটা গোপনীয়তার আবরণ। কিছু সময় পরেই তিন জন সিভিল সার্জন এসে আমাকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, আমি খুবই অসুস্থ, অনশনে ১৫ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। আগে থেকে সবই ঠিক। ডাক্তার নয়তো, জ্যান্ত বাঘ। টিকিটে লাল কালি দিয়ে লেখা হলো—যাতায়াতের উপযুক্ত। বেলা ৯টায় পুরনো পরিচিত প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল দাস

এসে বললেন, আজই তুমি দুপুরে আন্দামানে যাচ্ছ। তোমার ডিভিশন 'টু'র জন্য চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। কারণ তোমার মত dangerous রাজনৈতিক বন্দীকে সরকার উচ্চ শ্রেণী-ভুক্ত করবে না।

অবশেষে আজীবন সাজা নিয়ে আন্দামানের পথে যাত্রা শুরু হলো। গেটে নিয়ে আবার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি, হাতে হাতকড়া, মাজায় দড়ি লাগানো হলো। আলীপুর জেলে থাকতেই শুনেছিলাম এবার কোনো বন্দীকেই আন্দামানে পাঠানো হবে না। তাই জেলারকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর কেউ যাবে না?' জেলার উত্তর দিল: "না। এবার একমাত্র তুমিই যাচ্ছ।"

বন্দী-গাড়ীতে বসে দেখি সে-এক বিরাট ব্যবস্থা। আমার কয়েদী গাড়ীতে গুর্খা সৈন্য, সাহেব-সার্জেন্ট মিলে ৯/১০ জন। আমাদের গাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে গুর্খা সৈন্য ও সার্জেন্ট বোঝাই দুটো ট্রাক। মটর সাইকেলে সম্মুখে ও পিছনে তিন জন করে সার্জেন্ট। বড় বড় অফিসারদের কয়েকটি গাড়ী এবং সাদা পোশাকে অসংখ্য গোয়েন্দা পুলিশ। বন্দীদের নিকট শুনেছি, বন্দীদের প্রথম ব্যাচগুলো যখন আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তখন রাস্তায় যান-বাহন, ট্রাম-বাস, সাধারণ লোকের চলাফেরা—সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে কলকাতার বিশেষ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জাহাজে উঠে এলো এবং আমার সাথে আলাপ করতে করতে বললো, "এই তোমার শেষ যাত্রা আর তুমি ভারতে ফিরে আসতে পারবে না।" আমি বললুম, "সাহেব, আমরা ফিরে আসবই, কিন্তু স্বাধীন ভারতে তোমাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তোমরা কি রকম নির্দয় জানো? আমরা একই মামলার আসামী। দিনের পর দিন একসাথে কাটিয়েছি। সেই দীনেশ মজুমদারের সাথে আমাকে শেষ দেখা করতে দেওয়া হলো না।"

সাহেব হাসতে হাসতে বললো, "এর জন্য তুমি এত চিন্তা করছ কেন? আজ রাত্রেই তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে।"

ক্রোধ ঘৃণা ও অব্যক্ত বেদনায় মন ভারাক্রান্ত ও বিষিয়ে উঠল। একটি কথাও বলা আর সম্ভব ছিল না। মুখটা ফিরিয়ে নিলুম।

এমনি করে অনেক অনেক বন্ধুকে হারিয়ে সেদিনকার মতো পরাজিত বাহিনীর সৈনিক হিসাবে দ্বীপান্তরের পথে আমার যাত্রা শুরু হলো।

একটা লঞ্চ সাথে সাথে আমাদের অনুসরণ করছিল। ঠিক যেখান থেকে আর কূল-কিনারা দেখা যায় না সেই মহাসমুদ্র বক্ষে জাহাজ এসে থেমে গেল। লঞ্চটা এগিয়ে এসে জাহাজের বুকে লেগে নোঙর করল। দেখি, জেলের সিপাহী সহ জেলের তিনজন কয়েদী হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে জাহাজে উঠে এলো। কয়েদী পাঠাবার জাহাজ 'মহারাজ'-এ কয়েদী রাখার পৃথক পৃথক কোঠা রয়েছে। আমাকে কোঠায় ঢুকিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি কেটে দেওয়া হলো, হাতকড়া খুলে দেওয়া হলো। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনানুসারে সমুদ্রবক্ষে কোনো মানুষকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া বে-আইনী। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার প্রথমদিকে রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েকটি ব্যাচকে আন্দামানে পাঠাবার সময় এই আন্তর্জাতিক নিয়মটুকু পর্যন্তও রক্ষা করে নি। এই ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় সে সময় তীব্র সমালোচনা হয়েছিল।

যাহোক একটু পরেই আমার জন্মভূমি বাঙলাদেশের মাটি আমার দৃষ্টিপথ থেকে একেবারে দূরে মিলিয়ে যাবে। মনে মনে শুধু উচ্চারিত হতে থাকলো: বিদায় জন্মভূমি, বিদায়! শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশ, বিদায়! মাতৃভূমিতে আর কোনদিন ফিরে আসব কিনা কে জানে! ঠিক এই সময় স্পষ্ট দেখলাম, সূর্য পশ্চিম সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে।

অন্ধকারের কালো পর্দা এক পা এক পা করে চুপিসাড়ে নেমে এলো চারিদিকে। আমাদের জাহাজ "মহারাজ" সেই নিবিড়

সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকারে পাড়ি জমালো অথৈ সমুদ্রের বুকে।

মে মাস। বঙ্গোপসাগরে ঝড় ও তুফান সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। অকল্পনীয় কান-ফাটানো গর্জন। চারিদিকে শুধু গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ। এরি মাঝে সর্বদিক থেকে আবদ্ধ আমার কয়েদী কোঠায় আমি ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। 'পোর্টহোলে' (হাওয়া আসার ছিদ্র) মুখ নেওয়া যায় না। হঠাৎ হৃদয়-কাঁপানো জাহাজের হুঁশিয়ারি বাঁশি বেজে উঠল। চারিদিকে হৈ-চৈ, আর্ত চিৎকার। ভয়ার্ত খালাসীদের 'আল্লা' 'আল্লা' ডাক এই বিরাটকায় মহা-তুফানকে রোধ করতে পারছে না। আমার কোঠায় একটিমাত্র 'পোর্টহোল'। সেটার ভিতর দিয়ে জল এসে আমার কোঠা সব ভাসিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, জাহাজটাকে পাঁচতলার উপর উঠিয়ে ধপাস করে যেন মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। 'সাইক্লোন—সাইক্লোন' বলে চিৎকার উঠেছে। জাহাজে ঝড়ের বিপদ-সংকেত বার বার দেওয়া হতে লাগল। জাহাজ ডুবলে লাইফ-বেল্ট কিভাবে পরতে হবে তাও শেখানো হচ্ছে। আমাকে বেল্ট পরিয়ে দেওয়া হলো। বারবার ডাক্তার ও জাহাজের কাপ্তান এসে খোঁজ নিতে লাগল আমি কি অবস্থায় আছি। কিন্তু আমার কোঠার দরজা কিছুতেই খোলা রাখল না। অচিন্ত্যনীয় সেই একের পর এক বিরাট জলের ঢেউ। এই ঢেউ যে কত বড় হতে পারে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আমি কোঠায় কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে ভিজে একাকার হলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গে আছাড় ও নাকানি-চুবানি খেয়ে খেয়ে লোনা জলের দরুন অতঃপর আমার বমি শুরু হলো। তখন না পারি দাঁড়াতে, না পারি বসতে বা শুতে। ডাক্তারের উপদেশ 'মাথা তুলো না'—কিন্তু থাকি কোথায়?

আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি বিশাল নদী মেঘনার তীরে। ঝড়-বন্যার সাথে ছোটবেলা থেকেই আমি কমবেশি পরিচিত। অতীতের সেই পরিচয় এই প্রলয়ঙ্করী ভয়াবহ মহারাক্ষসীর নিকট

অতি নগণ্য বলে মনে হলো। এই অবস্থা রাত্রি ১১টা পর্যন্ত চললো। তারপরই ঝড়ের বেগ একটু কমে এলো। এলো ডাক্তার আর ঔষধ। ডাক্তার বললো, 'Thank God, we are safe.' সব ভিজে গেছে। লোনা জলে গা কিচ্ কিচ্ করছে। রাত সাড়ে এগারটায় খাবার এলো। আর এলো জাঙ্গিয়া, কোর্তা এবং কম্বল। এবার আর কয়েদী খাবার নয়, খালাসী খাবার।

দুপুরে ও রাত্রে ভাত, ডাল আর শুঁটকি মাছ। সকালে-সন্ধ্যায় কিছু সময় টাটকা হাওয়া পাবার জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া, এমনি করেই কেটে গেল ৫টা দিন। সমুদ্র শান্ত থাকলে ৪ দিন, বড়জোড় ৫ দিনে জাহাজ পৌঁছে যায়; কিন্তু আমাদের জাহাজ ৬ দিনের দিন ভোর বেলা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মাঝে প্রবেশ করল। কী সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য! ছোট ছোট দ্বীপ, সবুজের মমতা মাখানো সমারোহ। আমাদের বাঙলাদেশের মতই নারকেল গাছের সারি। রস (Ross) ও সেলুলার জেলের দালানকোঠা কি সুন্দরই না দেখা যাচ্ছে! ৬ দিনের দিন ভোর ৯টায় এবারডিনে 'মহারাজ' শেষপর্যন্ত নোঙর করল।

আমাকে গাড়ীতে তুলে পোর্টব্লেয়ার সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। জেল-ফটকে জেলার সাহেব ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিল। তাদের সম্মুখে উপস্থিত করার পর তারা আমায় হুঁশিয়ার করে দিল: 'সর্বদা মনে রাখবে, এটা বাঙলাদেশ নয় এটা আন্দামান।' মনে হলো, বাঙলার 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের' পোষ মানাবার দাপট অনেকটা কমে গেছে।

বন্দী-শিবির: সেলুলার জেল

বহুশ্রুত সেলুলার জেলের বন্দী-শিবিরে শুরু হলো আর এক জীবন। বিপ্লবী জীবনের এ যেন এক পর্বান্তর।

হাসপাতাল-সংলগ্ন একটা ওয়ার্ডে আমাকে নিয়ে তোলা হলো। আমার উপর নির্দেশ হলো 'কোয়ারেনটাইনে' (অর্থাৎ, স্বাস্থ্যগত কারণে বিচ্ছিন্ন করে রাখা) এই ওয়ার্ডে ৭ দিন থাকতে হবে। বহু দূরে এক বন্ধুকে দেখতে পেলুম। মনে হলো কোথায় যেন একে দেখেছি। সে চিৎকার করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। 'আসুন, ভাই আসুন, আপনার জন্য খাবার ঠিক করে রেখেছি।'— এই বলে সে জাঙ্গিয়ার ভিতর থেকে পায়খানা বের করে আমার মুখের সামনে এনে ধরলো—'খাও, দাদা খাও, এই, এই-ই আন্দামানে খেতে হবে।' চিনে ফেললুম। এই ছেলেটি আর কেউ নয়, ঢাকার ভূপেশ ব্যানার্জী। আন্দামানের বর্বর অত্যাচারে পাগল হয়ে গেছে। বুঝলুম, এই হলো আন্দামান।

জেল হাসপাতালে যে-ওয়ার্ডে আমাকে বিচ্ছিন্ন (কোয়ারেনটাইন) করে রেখেছে সেখান থেকেই খেলার মাঠটা দেখা যায়। ঠিক খেলার মাঠ নয়, বড় গৃহস্থ বাড়ির সম্মুখে একটা বড় উদ্যান যেন। একটি জোয়ান লোক কর্নার হতে ছুঁড়ে বলটিকে গোলপোস্টে ফেলে দিতে পারে। ঐ মাঠের মাঝে ছিল একটি পুরনো দালান। তারই ধ্বংসাবশেষ চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাথর ও

ইটে ভর্তি হয়ে রয়েছে মাঠের একটা অংশ। প্রতিদিন হাত-পা কাটে। তবু অনশন শেষ হবার কয়েকদিন পর জেলার সাহেব যখন একটা বল তুলে দিয়েছিল রাজবন্দীদের হাতে এবং বলেছিল, 'তোমরা প্রতিদিন বৈকালে ৫টায় এখানে খেলা করবে', তখন রাজ-বন্দীদের আনন্দ আর ধরে নি। আমি খেলোয়াড় ছিলুম, এ সংবাদ আন্দামান পৌঁছবার আগেই বন্ধুরা পেয়ে গেছে। ১২টার পর থেকেই দুই-একজন করে বন্ধু দেখা করতে শুরু করল। তাঁদের মাঝে অনেক পুরাতন পরিচিত বন্ধুরাও রয়েছে। নতুন বন্ধুদের কথা, 'সাবধান, অন্য কোনো টিমে খেলবেন না, আমাদের টিমে খেলতে হবে।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'টিমের নাম কি?' কেউ বললো, 'বাস্কার্স', কেউ বললো, 'কুক্লুস ক্লান।' আমি তো এসব নাম শুনে তাজ্জব বনে গেলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনারা এখানে কি করে খেলেন?' তাঁরা হেসে উত্তর দিলেন, 'খেলা নয়, আনন্দ করি।' বুঝলুম, অমানুষিক অত্যাচার, ইট-পাথর আর মহাসমুদ্রের মাঝে বিপ্লবী জীবনকে বাঁচাবার জন্য কী তীব্র সংগ্রাম তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাবাস আন্দামান রাজবন্দীরা, সাবাস তোমাদের দেশপ্রেম!

একটু পরেই দেখা করতে এলেন আমারই আবাল্য অতিপ্রিয় বন্ধু ফণীদা (ফণী দাশগুপ্ত)। আলীপুর জেলেই শুনেছিলাম, অনশন চলাকালীন নিষ্পেষণের পর থেকেই তার একটু মাথার অসুখের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বললেন, 'সুগা খাবি?' জিজ্ঞাসা করলুম, 'সুগাটি কি?' তিনি বললেন, 'সুগা হলো আন্দামানী ভাষায় খইনি। বিড়ি-সিগারেট জোটে না। দেয়ালে অফুরন্ত চুন আছে—ব্যাস এটাই খাই।'

বিকালের দিকে এলেন হীরাদা (শচীন করগুপ্ত), নিরঞ্জনদা ও খোকাদা। এই তিন জন দীনেশ মজুমদারের কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সব ঘটনা খুলে বলে শেষ কথা বললুম,

'খুব সম্ভবত ফাঁসি হয়ে গেছে।' তাঁরা কথাটা শুনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই তো আমাদের জীবন!

খোকাদা যাবার পূর্বে বললেন, 'অন্য কোনো টিমে নাম দিও না—আমাদের টিমে খেলবে।' নিরঞ্জনদা বললেন, 'এই মাঠে তোমার গোল কুলোবে না।'

সর্বশেষে এলেন অনন্তদা, গণেশদা। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত ফাঁসির রশিকে ফাঁকি দিতে পারলেন।' মাস্টারদার ফাঁসি, চন্দননগরের ঘটনা প্রভৃতি নিয়েও কিছুটা কথা হলো।

সাত দিন পর আমাকে রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমরা মাত্র দুটো ওয়ার্ডে ছিলুম। দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর থাকা-খাওয়া-রান্না—সবই তখন পৃথক।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী ডাকাত, খুনী প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ কয়েদীদের ২/৩ মাস জেলে রেখে বাইরে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হতো। তারা নিজেরা কাজ করে খাবার ব্যবস্থা করত অথবা সরকারী ক্যাম্পে থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করতে পারত। সরকার তাদের কাজের মাহিনা দিত। দুই-তৃতীয়াংশ খাটনি হলেই তারা মুক্তি পেত।

আন্দামানে একটি গল্প প্রচলিত আছে—বিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন আন্দামানে কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তখন বেশ কিছু মহিলা কয়েদী এবং বেশ কিছু বাইরের মহিলাকে সংগ্রহ করে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত কয়েদী এবং মহিলা বিবাহ করে আন্দামানে ঘর-সংসার করতে প্রস্তুত তাদের নিয়ে লটারী করা হয়। এই ব্যবস্থায় একটি পাঠানের সাথে পূর্ববাঙলার একটি ব্রাহ্মণ কন্যার যেমন বিবাহ হয়েছে, ঠিক তেমনি ওড়িশার একটি হিন্দু ছেলের সাথে বার্মার একটি মুসলমান মেয়েরও বিবাহ হয়ে গেছে। ছেলেরা পিতার পদবী ও পরিচয় গ্রহণ করত এবং মেয়েরা মায়ের পরিচয় দিত। এরাই হলো আন্দামানের স্থায়ী

বাসিন্দা (local born) এবং এদের অধিকাংশ আদিবাসী।

ব্রিটিশ সরকার যখন দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবীদের আন্দামানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয় তখনই বাঙলাদেশ থেকে কিছু জেল-পুলিশ ও ধূর্ত বড় জমাদার লালু সিংকে তাদের সাথে দেওয়া হয়। রাজবন্দীদের রান্না-বান্না ও কাজকর্ম করার জন্য কয়েকজন সাধারণ কয়েদীকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষ রেমিশন দেবার প্রতিশ্রুতি (জেল খাটার দিন কমিয়ে দেওয়া) দিয়ে রাজবন্দীদের সাথে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজবন্দীদের সঙ্গে এরাও পি. আই. জেল-খানার স্থায়ী বাসিন্দা। অসুস্থতা ও সাজা কমে যাওয়ার কারণে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছেন তাদের সংখ্যা বাদ দিলে রাজবন্দীদের সংখ্যা দাঁড়ায় শ'খানেক। অনশনে তিন জন বীরসংগ্রামী বন্ধুকে চিরদিনের জন্যে বিদায় দিয়ে যে সুযোগ-সুবিধা রাজবন্দীরা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল তা অতি আস্তে আস্তে ছোট খাটো সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে আদায় করে নিতে হতো। তখন সবেমাত্র ওয়ার্ডগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মিস্ত্রী কাজ করতে শুরু করেছে। তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীরা সবেমাত্র সেলে আলো জ্বালার অনুমতি পেয়েছে। হ্যারিকেন বা তেলের পয়সা রাজবন্দীরা কোথায় পাবে? কিন্তু নতুন জিজ্ঞাসা ও জানবার উন্মাদনা এমন যে, মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রে সেলে পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছে। সঠিক বিপ্লবী পথ কি তা জানবার ও বুঝবার আগুন বন্দীদের হৃদয়ে তখন জ্বলে উঠেছে।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনে ১৯৩৪ সাল একটা গুরুত্বপূর্ণ টানাহেঁচড়ার বছর। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের দেশব্যাপী ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষাধিক লোকের কারাবরণ এবং অগণিত সংগ্রামী নারী-পুরুষের মৃত্যুবরণও অহিংস পন্থায় নৃশংস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের "হৃদয়ে পরিবর্তন" আনতে সক্ষম হয় নি।

একদিকে ভারতীয় জনতার উপর কল্পনাতীত সীমাহীন নিষ্পেষণ, অপরদিকে সুচতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩০ সাল থেকেই বঁড়শির টোপ ফেলার মতো একটির পর একটি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ডেকে ভারতবর্ষে নিজেদের স্বার্থে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের উচ্ছিষ্ট সামান্যতম রুটির টুকরোটুক পাবার আশায় ও লোভে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদী দালাল, চরম সুবিধাবাদী দল ও ব্যক্তিরা ব্রিটিশের তোয়াজ করে চলেছে এবং কবে গদিতে বসতে পারবে সেজন্য ওৎ পেতে বসে আছে। তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর দেশের ভিতর থেকে ক্রমাগত চাপও সৃষ্টি করছিল।

এদিকে বাঙলাদেশে তখন চলেছে এণ্ডারসনী নগ্ন শ্বেতসন্ত্রাসের রাজত্ব। জাতীয় বিপ্লববাদী দলগুলোর পরাজয় তখন শুরু হয়ে গেছে। অসংখ্য যুবকের হাসিমুখে মৃত্যুবরণ, হাজার হাজার কর্মীর জেল, বছরের পর বছর অন্তরীণ এবং সুদূর কালাপানিতে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন, শত শত পরিবারের চরম দুর্গতি ও ধ্বংস গোটা রাজনৈতিক জীবনে সৃষ্টি করেছে চরম হতাশা ও নৈরাশ্য।

সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক মহলে সর্বত্রই এক জিজ্ঞাসা এক চিন্তা—ব্রিটিশকে পরাজিত করে এবারও তাহলে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা গেল না? জনগণের সীমাহীন আত্মত্যাগ সত্ত্বেও কংগ্রেসের অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হলো। ব্যর্থতার পরিণতি হিসেবে স্বাভাবিকভাবে এলো আত্মকলহ। সাম্প্রদায়িক হলাহল, পারস্পরিক দোষারোপ এবং তীব্র আত্মসমালোচনাও মানুষের মনকে গ্রাস করল।

এরি মধ্যে অধিকাংশ বিপ্লবী কর্মী নতুন পথের সন্ধানে গভীর আলোচনা ও ব্যাপক পড়াশুনা শুরু করলেন। ব্রিটিশের শৃঙ্খল চূর্ণ করে জনতার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার অটল সংকল্প তাঁদের মনে এতটুকু ম্লান হয়নি বরং তা আরো দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হলো।

"দেশকে স্বাধীন করব অথবা মৃত্যুবরণ করব"—এই অটল প্রতিজ্ঞা ও আত্মপ্রত্যয় বিপ্লববাদীদের হৃদয়ে গভীর থেকে আরো গভীরে প্রবেশ করল। তন্ন তন্ন করে শুরু হলো নতুন পথের সন্ধান।

কোন্ পথে ভারতের স্বাধীনতা আসবে? অল্পসংখ্যক অসীম সাহসী শিক্ষিত দেশপ্রেমিক যুবক অকুতোভয় সাহসে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করলেই কি দেশের স্বাধীনতা আসবে? দেশে এমন কোন্ শক্তি আছে যা সচেতন ও সংগঠিত হলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে পরাজিত করা সম্ভব এবং ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকেও মুক্ত করা যায়? এই ধরনের গভীর চিন্তা ও জিজ্ঞাসা রাজবন্দীদের মন আচ্ছন্ন করল। রাজনৈতিক কর্মীদের মনে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি? কার স্বাধীনতা? ইংরেজকে তাড়িয়ে আমরা কোন্ বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে চাই? আমাদের দুঃখ ও দৈন্যের জন্য দায়ী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে তাড়াতে হবে, এই ব্যাপারে দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ব্যতীত সকলেই একমত। কিন্তু ইংরেজকে চাই না, এই নেতিবাচক উত্তরে ঐক্যমত্য থাকলেও আমরা দেশে কোন্ বা কিরকম বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই—এই ইতিবাচক প্রশ্নে মত-বিরোধ ছিল রাজবন্দীদের মধ্যে।

ইংরেজ চলে যাবার পর ধনিক, বণিক, জমিদার, রাজা, নবাব প্রভৃতি রক্তচোষা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ক্ষমতা আসবে, এটাই কি আমাদের কাম্য? সাদা চামড়ার পরিবর্তে চরম অত্যাচারী ব্রিটিশ দালাল ও আমলাতন্ত্র আর কালো চামড়ার বড় বড় শিল্পপতি ও জমিদার গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা আসবে, এটাই কি সত্যিকারের রাজনৈতিক স্বাধীনতা? এর মধ্যেই কি জনগণের মুক্তি? এরই জন্য কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনতা—কৃষক, মজুর, বুদ্ধিজীবী ছাত্র, যুবসমাজ, মধ্যবিত্ত বার বার হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ

করেছে? এই সমস্ত প্রশ্ন, অনুসন্ধিৎসা ও আত্মসমালোচনা রাজবন্দীদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল—চিন্তাজগতে উন্মোচিত হলো এক নতুন দিগন্ত।

বিদেশী ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ আমাদের দেশের জনতার জীবনে দারিদ্র্য ও বুভুক্ষাকে নিত্য সহচর করে তুলেছে। আমাদেব দেশের মানুষ পশুর মতো জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এটাকে ভগবানের করুণা বলে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিতেই জনতাকে শেখানো হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক —সর্বক্ষেত্রে মানুষের মেরুদণ্ড ও মনুষ্যত্ব গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগ, শোক, অনাহার ও দুঃখে জর্জরিত মানুষ আসল শত্রুকে চিনছে না, একেই নিয়তি ও ভাগ্যের বিড়ম্বনা কিংবা অভিশাপ বলে মেনে নিয়েছে। দেশের মানুষ পরাধীনতাকে এবং দারিদ্র্যকে অলঙ্ঘনীয় চিরসত্য বলে ধরে নিয়েছিল, এটা হলো আর এক বড় অভিশাপ। দেশ পরাধীন ছিল এটাই সব কথা নয়। আমরা জাতি, ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ ও গোত্রে শতধা বিভক্ত ছিলুম। অনুন্নত দেশ হিসাবে আমাদেব মধ্যে ঘটেছিল অসম বিকাশ। "বিভক্ত রাখো এবং শাসন করো"—এই নীতির দ্বারা আমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শত শত বছর উপমহাদেশের জনতাকে নির্মম শাসন ও শোষণ করে এসেছে। তাই গরীব ও মেহনতী জনতার দুঃখের ও লাঞ্ছনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যে-স্বাধীনতা জনগণের দারিদ্র্যের চির অবসান ঘটাবে না, রাজনৈতিক ক্ষমতা জনতার হাতে এনে দেবে না, সেই-রূপ স্বাধীনতা আমরা চাই নি—এই কথাগুলো আমরা কমবেশি আন্তরিকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার বলে এসেছি। জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সীমাহীন দেশপ্রেম—এটাই তো আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল।

বাস্তব জীবনের নির্মম ও নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় সব কিছুই নতুন

করে ভাবতে হচ্ছে। আমাদের ছিল অফুরন্ত ভাবাবেগ, দেশপ্রেমের আবেগ ও উন্মাদনা; কিন্তু ছিল না শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব কষ্টিপাথরে জীবনের অভিজ্ঞতা। যুক্তিবিজ্ঞানের পথে নতুন করে সকলকে ভাবতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে, পড়তে হচ্ছে এবং বুঝতে হচ্ছে।

মানবসমাজের সত্যিকার কল্যাণের পথ কী? কোন্ বৈজ্ঞানিক পথে মানবসমাজ ও গোটা ভারতবাসী সত্যিকার মুক্তি পেতে পারে? সেই শক্তিকেই খুঁজে বের করতে হবে—এটাই ছিল ১৯৩৪ সালে আন্দামান বন্দীদের পথ খোঁজার মৌল দৃষ্টিভঙ্গী।

এই কাজেই পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিল আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা। সীমাবদ্ধ সুযোগের মাঝেও তীব্রভাবে শুরু হয়েছিল আত্মসমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, পড়াশুনা ও পথের সন্ধান। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতি গভীরভাবে পড়ার ধুম পড়ে গিয়েছিল আন্দামানের বন্দীশালায়।

১৯১৭ সালের মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতীয় মজুরশ্রেণী অতি ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। কমিউনিজম সম্পর্কে আমাদের মাঝেও কিছু কিছু প্রশ্ন জাগছিল।

১৯২৯ সালে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা মীরাটে শুরু হয়েছিল। ঐ মামলায় কমিউনিস্ট বন্দীরা কোর্টে এইরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন: 'কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি···আমাদের মাতৃভূমি ভারতের মাটি হতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজত্ব শেষ করে দিতে চাই। আমরা মজুর-কৃষকরাজ কায়েম করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। একমাত্র এই পথেই সমস্ত মানুষের দুঃখ-কষ্টের চিরঅবসান হওয়া সম্ভব··· আমরা গণবিপ্লবের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই··· ।'

সেই দিনগুলোতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। কারণ, তখন একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের দেশব্যাপী ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন, অপরদিকে জাতীয় বিপ্লববাদীদের দুঃসাহসিক চরম আত্মত্যাগী প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সশস্ত্র সংগ্রামই দেশকে গভীরভাবে আলোড়িত করে চলছিল।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের তদানীন্তন ব্যর্থতা, পশ্চাৎপদ রাশিয়াতে একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য, সর্বত্র ধনতান্ত্রিক সভ্যতার নগ্ন সংকট এবং দেশে-বিদেশে মজুরশ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলন বিপ্লববাদীদের ধ্যান-ধারণায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে গভীর রেখাপাত করতে শুরু করেছিল। জেল, ক্যাম্প, আন্দামান—সর্বত্র রাজবন্দীরা ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কী ও কেন, এই বিষয়ে পড়াশুনা ও আলোচনা শুরু করেছিল।

আগেই বলেছি, ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিতেও বেশ কিছুটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে: গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস সংগঠন আইনসম্মত হয়েছে আর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সমাজে অসাম্য দূর করার জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র সমাধান, একথাগুলো বলতে শুরু করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। অহিংস কংগ্রেস বন্দীরা সকলেই মুক্তি পেয়েছে। জাতীয় বিপ্লববাদী বন্দীরা ও রাজবন্দীরা মুক্তি পায়নি।

১৯৩০-৩৪ সালে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। কিন্তু যতই সময় এগিয়ে চলছিল, ততই জাতীয় বিপ্লববাদী কর্মীরা সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে কমিউনিজমের পথ বেছে নিতে শুরু করছিল। সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করাবার ব্যাপারে

যে-সমস্ত রাজবন্দীর অবদান ক্যাম্প ও জেলে সবচেয়ে বেশি তাঁদের মধ্যে কালী সেন, আবদুল হালিম, সবোজ মুখার্জী, আবদুর রেজ্জাক খান, জালালুদ্দিন বোখারী, রেবতী বর্মন, ভবানী সেন এবং আন্দামানে ডাঃ নারায়ণ রায় ও নিরঞ্জন সেন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামানে পাঠাবার আগে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কারাগারে—লাহোর, মাদ্রাজ, বোম্বে, রাজমহিন্দ্রী, হাজারিবাগ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, যারবেদা প্রভৃতি জেলে এই সমস্ত বন্দীদের পাঠিয়েছিল। তখন ভারতে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত এক নম্বর শত্রু ছিল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলগুলো। তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্য দিকে মোড় ঘুরাবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তখন ক্যাম্প ও জেলে সমাজতান্ত্রিক বই-পুস্তিকাদি রাজবন্দীদের দেবার ব্যবস্থা করেছিল।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহ—গোটা দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চরম সঙ্কট, বেকারহীন সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত আর্থনীতিক অগ্রগতি, চীনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরামহীন সংগ্রাম, স্পেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন উন্মেষ, আর জাতীয় ক্ষেত্রে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতা, ধীরে ধীরে সংগঠিত মজুরশ্রেণীর অগ্রগতি প্রভৃতি রাজবন্দীদের চিন্তায় ও চেতনায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল।

বাঙলা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে যখন দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের আন্দামানে নিয়ে উপস্থিত করা হলো তখন দেখা গেল কিছু কিছু রাজনৈতিক বন্দী ইতিমধ্যেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছে এবং বেশ কিছু রাজবন্দী কমিউনিস্ট মতবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে শুরু করেছে। অধিকাংশ বন্দী তখনও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলেই রয়েছে। আর জাতীয়তাবাদী অধিকাংশ বন্দীদের কমিউনিস্ট বিরোধিতাও

রয়েছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঐতিহ্যপূর্ণ পুরনো দল ভেঙে নতুন আদর্শ গ্রহণ করা এবং কমিউনিস্ট দলে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধেও রয়েছেন অনেক বন্দী। এই সময় পুরনো কমিউনিস্ট বন্দী কেউ আন্দামানে ছিল না। তবু আন্দামানে রাজবন্দীদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের পুরোধা বলা যায় নারায়ণদা ও নিরঞ্জনদাকে। এই পুরোধাদের প্রেরণায় আন্দামানে অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে এক-যোগে রাত জেগে পড়াশুনা শুরু করেছিলাম।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত গোটা ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দুঃসাহসিক বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, অকুতোভয় দেশপ্রেমের অপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করে যাঁরা সেদিন গোটা ভারতের রাজনীতিতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের মাঝে যাঁরা ফাঁসির রশিকে ফাঁকি দিয়েছিলেন বা দীর্ঘ-মেয়াদী সাজা পেয়েছিলেন, প্রধানত তাঁদের নিয়েই ছিল এবার কার আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীগোষ্ঠী। প্রধানত বললাম এই কারণে যে, ১৯২৮ সালের পূর্বেও কয়েকটি রাজনৈতিক মামলার আসামীদের এখানে আনা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিলেন: (১) অনন্তনারায়ণ চক্রবর্তী (ভোলাদা) (২) ধ্রুবেশচন্দ্র চ্যাটার্জী (৩) রাখালচন্দ্র দে। এই তিন জন বন্দীই দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা চলার সময় আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতবন্দী হিসাবে ছিলেন। আলীপুর জেলে যে-ঘটনার পর যে-ইয়ার্ডের নামকরণ 'বোম-ইয়ার্ড' হয়ে যায় সেখানেই এই সমস্ত বন্দীদের রাখা হতো। বাইরের থেকে গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জী মাঝে মাঝে জেলের ভিতরে যেয়ে এই সমস্ত রাজ-নৈতিক বন্দীদের সাথে মোলাকাত করত। বন্দীদের লোভ দেখিয়ে, ভীতি প্রদর্শন করে বা ফুস্‌লিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টাও করা হতো। রাজনৈতিক বন্দীরা গোয়েন্দা পুলিশের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তারপর সাম্রাজ্য-

বাদের পা-চাটা কুকুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যা করে ইয়ার্ডে ফেলে রেখে দেয়। এই মামলায় অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ সেনগুপ্তের ফাঁসি হয় এবং অনন্ত চক্রবর্তী, রুবেশ চ্যাটার্জী এবং রাখাল দে-কে আজীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। প্রথমে তাঁদের বার্মা দেশের মান্দালয় ও রেঙ্গুন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সালে তাঁদের সেলুলার জেলে আনয়ন করা হয়। অন্য বন্দীদের মধ্যে ছিলেন:

(৪) নিখিলরঞ্জন গুহরায়—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিখ্যাত শিবপুর ডাকাতি মামলায় ইনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩০ সালে কান্দি বোমার মামলায় পুনরায় দণ্ডিত হলে তাঁকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়।

(৫) সর্দার গুরুমুখ সিং—'কামাগাটা মারু' জাহাজে আগত বিপ্লবী কর্মীদের সাথে ১৯১৭-১৫ সালে গার্ডেনরীচে পুলিশের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের সৈনিকরূপে সর্দার গুরুমুখ সিং-এর ফাঁসির হুকুম হয়। সে সময়ে নাবালক বলে ফাঁসির হুকুম রদ করে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড দেওয়া হয়। সর্দার গুরুমুখ সিং ও তাঁর সহ-কর্মীরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড নিয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত আন্দামানে ছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শেষপর্যন্ত বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনে। দক্ষিণ ভারতের জেলে থাকা অবস্থায় সর্দার গুরুমুখ সিং ও পৃথ্বী সিং কারাগার থেকে পলায়ন করে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে সর্দারজী মহান লেনিন প্রতিষ্ঠিত পূর্ব এশিয়ার মেহনতী জনতার বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিক্ষার পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

সর্দার গুরুমুখ সিং এরপর ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকা গমন করে সেখানে পুরনো "গদর (বিপ্লব) পার্টি"-র কর্মীদের ভারতের

ও কানাডার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালান। ১৯৩৪ সালে একবার আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারতে আসার পথে আফগান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন অনশনের পর সোভিয়েত সরকার তাঁকে সোভিয়েত নাগরিক হিসাবে দাবি করলে আফগান সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি পুনরায় ১৯৩৬ সালে পালিয়ে ভারতে আসেন এবং পরে পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বৃদ্ধ সর্দারজীকে অতীতের আজীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড খাটাবার জন্য পুনরায় আন্দামানে প্রেরণ করে।

এই ৫ জন রাজবন্দী ব্যতীত সকল রাজনৈতিক বন্দীই ছিল ১৯২৯-৩৫ সালের বিপ্লববাদী কর্মকাণ্ডের কর্মী।

অনশনের পর রাজবন্দীদের জীবনধারা

যাহোক ইতিপূর্বে যে অনশনের কথা বলা হয়েছে সেই অনশনের পূর্বে আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিকভাবে জীবনযাপন তো দূরের কথা, এমন কি পশুর মতো জীবনযাপন করে বেঁচে থাকাও অসম্ভব ছিল। এই অমানুষিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের বিদ্রোহ—আমরণ অনশন ধর্মঘট। তিন জন বন্ধুকে হারিয়ে, অনেক বন্ধুর জীবন পঙ্গু হবার পর, কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা আস্তে আস্তে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা পেতে শুরু করেন।

পূর্বের মতো প্রতিদিন দড়ি পাকাতে হলেও কাজের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। নিজেদের হাতে কিচেন, রান্না ও খাবার ব্যবস্থা রাজনৈতিক বন্দীরা নিজেরাই করার সুযোগ পেল। আই. বি. পরীক্ষিত ও সরকারী অনুমতিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্ত বইগুলো একত্র করে একটা লাইব্রেরি করার ব্যবস্থাও হলো। বিভিন্ন প্রদেশের বাঙলা, ইংরাজী, উর্দু, হিন্দি, তামিল, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সরকার-সমর্থক সপ্তাহিক, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস ও মাসিক কারেণ্ট এফেয়ার্স পত্রিকা রাখবার ব্যবস্থা হলো। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জেল-কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হলো। সর্বদলের সমন্বয়ে গঠিত হলো সর্বপ্রথম হাউস কমিটি। এই সময়ও রাজনৈতিক বন্দীদের

দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী হিসেবে দুটি পৃথক ইয়ার্ড ও দুটি কিচেন যথারীতি বহাল রইল।

তিনজন রাজনৈতিক বন্দীর হত্যার সংবাদ জানার পর ভারতে চরম নিষ্পেষণের মধ্যেও যতটুকু আন্দোলন হয়েছিল তাতেই আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবহার সংক্রান্ত রীতি-নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হলো। এরি ফলে সর্বোচ্চ আমলাতান্ত্রিক ঠাট ও আইনের কড়াকড়ি বজায় রেখেও তলেতলে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা রাজনৈতিক বন্দীদের দেওয়া হলো। চীফ কমিশনার জেলে 'আগমন' করলে তখনও "রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের" সেল-বন্ধ করে বহুদূরের গম্বুজ থেকে দূরবীন দিয়ে দেখার ব্যবস্থা চালু রইল। চীফ কমিশনার এবং জেল সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল ব্রিটেন থেকে সদ্য আগত প্রাক্তন মিলিটারী অফিসার। তাদের সঙ্গে নুন, তেল, মশলা ইত্যাদি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাটি আর মিলিটারী মেজাজে ধমকা-ধমকি প্রায়শ লেগেই ছিল। মাঝে মাঝে জেল-কর্তৃপক্ষের সাথে তীব্র ঝগড়ার প্রতিবাদে একবেলা বা দু-একদিনের অনশনও চলছিল। সামান্য গোলমাল হলেই খেলাধূলা, পড়াশুনা ও মেলামেশার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা এবং ভিন্ন ওয়ার্ডে যাওয়া-আসার দরজাগুলো ঝপ্ ঝপ্ করে বন্ধ করে দেওয়া হতো। মাঝে মাঝেই 'তুম ভি মিলিটারী—হাম ভি মিলিটারী' বলে একটা সাময়িক মীমাংসাও করে নেওয়া হতো। জেল-কর্তৃপক্ষ বুঝেছিল—পড়াশুনা আর একসাথে খেলাধূলা আমাদের জীবন—তাই তারা সামান্য গোলমাল হলেই এই দুটোর উপরে প্রথম আঘাত হানত।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক বন্দীরা সকলে মিলে (১) একটি হাউস কমিটি (২) একটি খেলাধূলা কমিটি (৩) একটি লাইব্রেরি কমিটি গঠন করেছিল। দুটো কিচেন বা রন্ধনশালা থাকলেও মাঝে মাঝে পরস্পর খাওয়া-দাওয়া এবং খাবার জিনিস

দেওয়া-নেওয়াও চলছিল।

আন্দামানের বন্দী-শিবিরে এইভাবে যখন আমরা সুসংহত জীবনযাপনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি তখন একটা হৃদয়বিদারক বীভৎস ঘটনা ঘটে গেল।

এই সময় জেলের প্রধান ডাক্তার ছিল টড সাহেব। সে সর্বদা পাষণ্ডের মতো ঘোষণা করত: "আমি তোমাদের ঘৃণা করি, কারণ তোমরা আমার ভাইদের হত্যা করেছ।" উত্তরে বন্ধুরা বলতো: "তোমরা যে প্রায় দু'শ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পশুর মতো শত শত ভারতবাসীকে হত্যা করছ, মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছ, আমাদের দেশকে জোর করে লুণ্ঠন করছ—এর উত্তর কে দেবে?" তারপরই চটাচটি ও কিছুটা মারপিট। এমনি কয়েকটি ঘটনায় কয়েকজন বন্ধুর—(১) প্রবীর গোস্বামী (ময়মনসিংহ), (২) সুখেন্দু দাস (ময়মনসিংহ), (৩) চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), এদের—প্রত্যেকের ১৫ বা ২০টি করে বেত্রদণ্ডের আদেশ হলো।

বেত্রদণ্ড হলো মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে সাজা দেবার এক ঘৃণ্য বীভৎস ব্যবস্থা। বন্দীকে 'টিক-টিকি'-র, (মিছুটা মই-এর মতো) উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দুখানি হাত-পা প্রসারিত করে 'টিক-টিকি'-র সাথে কড়া দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হয়, এরপর বন্দীকে উবুড় করে জাঙ্গিয়া খুলে অনাবৃত করে দেওয়া হয় তার নিতম্ব। একেবারে নতুন পাকা বেত—দুই হাত দীর্ঘ। যে আঘাত করে সে হলো জেলখানার হাজার হাজার কয়েদীদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ জোয়ান ও নির্দয় মানুষ। জোয়ান লোকটা রণহুঙ্কার দিতে থাকে। সে বেতখানা শক্ত করে ধরে একবারে না এসে দুপা এগিয়ে এসে আধখানা ঘুরপাক খায়, তারপর ছুটে এসে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত হানে সেই নগ্ন নিতম্বের উপর। সমস্ত বন্দীরা তখন সেলে আবদ্ধ থাকে। জেল জুড়ে বিরাজ করে শুধু গভীর নিস্তব্ধতা ও গুমগুম আওয়াজ। প্রত্যেকটা আঘাতে কেটে যাওয়া চাই, রক্ত ঝরা চাই—এই হলো বেত্রাঘাতের নিয়ম।

বেত্রাঘাতের সময় সেল-বন্দী বন্ধুরা এবং রাজনৈতিক বন্দীরা স্লোগান দিত—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'স্বাধীন ভারত কি জয়'। বন্ধুদের উপর এই ধরনের প্রত্যেকটা বেতের আঘাত শুধু আমাদের চোখের অশ্রু নয়—মনের রক্তও ঝরিয়ে দিত। একদিন এই নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক বন্দী উপবাস করে প্রতিবাদ জানাল।

এই ঘটনার পরও টড্ সাহেব বলতো, 'আমি তোমাদের ঘৃণা করলেও ডাক্তার হিসাবে তোমাদের চিকিৎসা ঠিক করব।' এক অস্বাভাবিক পরিবেশে রাজনৈতিক বন্দীদের এই পশুকে দিয়েই চিকিৎসা করাতে হয়েছে। অত্যাচার, অপমান ও বীভৎসতায় অনেক সময়ই পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থার সৃষ্টি হতো। মানুষের মতো বাঁচতে হবে, আবার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে হবে, ইংরেজ রাজত্বকে শেষ করে দেশকে স্বাধীন ও সুখী করতে হবে—এই অটল দৃঢ়তা ও ধৈর্যই রাজনৈতিক বন্দীদের অনেককে স্বাভাবিক জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

দেয়াল-ঘেরা সেলুলার জেলের কয়েদী-জীবনে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। নিত্য নতুন লোক আসে না এই জেলে। চারিদিকে সমুদ্রঘেরা। যতদূর চোখ যায়—শুধু জল, কালো জল—বিশাল জলরাশি। 'রস'-এর ছোটখাটো টিলা—তার উপর বড় বড় অফিসারদের বাড়িগুলোই সেলুলার জেলের একমাত্র বৈচিত্র্য। একঘেয়ে বন্দীজীবন—থালা-বাটি, কম্বল, ফাইল, কাজ—খাওদাও, লক-আপে ঘুমাও, সুযোগ পেলেই একটু খেলো কিংবা পড়াশুনা কর। তবু এর মাঝেই আনন্দ করার সুযোগ করে নিতে হয়। জীবন মানেই সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাজিত হতে রাজনৈতিক বন্দীরা কিছুতেই রাজী নয়।

জেলের কয়েদীদের বিশেষ ছুটির দিন হলো ঈদ ও পূজা। বন্দীজীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন হলো এ-দুটো দিন। এই দিনে বন্দীদের কোনো কাজ থাকে না। এই দিন ছুটিতে তারা পরস্পর মিশতে পারে

এবং একটু ভালো খাবারও পায়। ধর্মের দিক থেকে নয়, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করা যায়, কথাবার্তা বলা যায়—এটাই সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। রাজনৈতিক বন্দীরা জেলে, হাজতে সুদূর আন্দামানে যেখানেই রয়েছে সেখানেই এই দিনগুলোকে এই কারণেই তারা উৎসবের দিন হিসাবে পালন করার চেষ্টা করেছে। মাসিক বেতন দিয়ে 'সদাশয়' ব্রিটিশ সরকার প্রতিটি জেলে পুরোহিত, মৌলানা ও ধর্মযাজক রাখত। তারা সপ্তাহে একদিন আসত কয়েদীদের ধর্মোপদেশ বিলোবার জন্য। তাদের উপদেশ হলো : রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে, এ হেন 'সদাশয়' ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ধর্ম-বিরোধী অপরাধ এবং এটা কোরান, গীতা ও বাইবেল-এরও বিরোধী। বিচ্ছিন্ন সেল ও বিভিন্ন ইয়ার্ডে রাজনৈতিক বন্দীরা থাকত। ধর্মোৎসব উপলক্ষে সমাবেশের স্থানটি ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের জেল খানায় একমাত্র মিলনক্ষেত্র। রাজনৈতিক বন্দীরা সহজে এই সুযোগটা ছাড়ত না।

আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীরাও ১৯৩৪ সালে পূজা-উৎসব পালন করার অনুমতি চাইল। কিছুটা ধস্তাধ্বস্তির পর জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতিটা পাওয়া গেল। কিন্তু ১৯৩৪ সালের পূজাটা হলো কিছুটা আনুষ্ঠানিক ভাবে। উৎসব জমে উঠল না, কারণ জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কটা তখনও তিক্ততার মধ্য দিয়ে চলছে। ১৯৩৫ সালে যখন জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তখন এই কারাগারের মধ্যেই পূজা উপলক্ষ করে রাজনৈতিক বন্দীরা থিয়েটার ও যাত্রা করল। যদিও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের রক্তে রন্ধ্রে মিশে আছে, তবুও ত্রিশ দশকের রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে ধর্মের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই ছিল। তাই পূজা কমিটির প্রধান উদ্যোক্তা হলো সিরাজুল হক (হুগলী)। আলীপুরেও দেখেছি জেলে ঈদ্ কমিটির সভাপতি ছিল সুনীল চ্যাটার্জী।

অনশনের পর যখনই কিছু বই ও আলোর সুবিধা পাওয়া গেল, তখনই রাজনৈতিক বন্দীরা ব্যক্তিগতভাবে ও গ্রুপ করে পড়াশুনার উপর জোর দিয়েছিল। নতুন কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী বন্ধুরা এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করল। অবস্থাটা সেলুলার জেলে ক্রমে এমনই দাঁড়াল যে পড়াশুনা না করে কারো উপায় নেই।

রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তখন চলেছে তীব্র আত্মসমালোচনা, নতুনভাবে এগিয়ে যাবার জন্য পথের সন্ধান। এক চিন্তা, এক ধ্যান—খুঁজে বের করতে হবে মুক্তির সঠিক পথ। ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিতে পড়াশুনা ও আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে যারা মার্কসবাদের পথ বেছে নিয়েছে তারা ঠিক করল, যতদিন পর্যন্ত না কেউ কমিউনিস্ট বলে নিজেকে ঘোষণা করবে ততদিন তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করা হবে না।

দুদিন আগেও এই সমস্ত বন্ধু ছিল জাতীয় বিপ্লববাদী বা একই সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী। অতীতেও বহুবার দেখেছি এবং আজো দেখছি জনতার মৌলস্বার্থ, সুদূরপ্রসারী স্বার্থ এবং বিপ্লবের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও গোষ্ঠীস্বার্থের চিন্তার প্রবণতা আমাদের মধ্যে কিরকম প্রবল এবং এই প্রবণতা কিভাবে জনতার বৈপ্লবিক অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনেও নেমে এল চরম সংকট। 'রক্তে মোদের লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা'—আমি হলাম সেই দলের লোক। দেশকে স্বাধীন করতে পারলুম না এবং মৃত্যুও হলো না। পড়াশুনার পালা পূর্বেই শেষ করে এসেছি। পলাতক জীবন, লড়াই, জেল এবং আবার পলাতক জীবনের মাঝেই বছরগুলো কেটে গেছে। আবার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে পড়শুনা শুরু করতে হবে তা কল্পনাও করি নি।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু

কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের কথা পূর্বেও কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু যা শুনেছি এবং যা পড়েছি মনের মতো করে তার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে নিয়েছি মাত্র। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখনকার দিনের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী আন্তরিকভাবে বলেছি : "আমরাও তো সমাজতন্ত্রবাদ চাই। প্রথমে ইংরেজকে তাড়াতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের গরীব, অনুন্নত ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন দেশের সকল মানুষের দুঃখকষ্ট ঘোচাব, সকল মানুষের সম অধিকার কায়েম করব—এইতো স্বাধীনতা, ইত্যাদি।" এই কথাগুলো মুখে বললেও এসবের মর্মবস্তুতে তখনও প্রবেশ করতে পারি নি, হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি এর আসল অর্থ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে একটি বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ যে তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে বিকশিত এবং সমৃদ্ধিশালী হয়, বিজ্ঞানের ছাত্রের মতোই যে একে অধ্যয়ন এবং কর্মে প্রয়োগ করতে হয়, তা তখনো বুঝি নি। জনতার দুঃখকষ্টে সীমাহীন বেদনা, নৃশংস জুলুমশাহী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি চরম ঘৃণা, প্রতিনিয়ত পরাধীনতার বৃশ্চিক দংশন, দেশপ্রেমের আবেগ ও উন্মাদনা—মনকে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে, মধ্যবিত্ত-চেতনাকে তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মজুরশ্রেণী ও মেহনতী জনতার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁদেরই একজন হয়ে ভাবা—তখনও জীবনে স্পষ্ট হয় নি।

স্বাধীনতার কথা, ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াবার আলোচনা, বাড়িতেই প্রথম শুনেছি। কারণ, আমার কাকা ছিলেন বিপ্লববাদী বড় নেতা। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথাটা খুব সম্ভব প্রথম শুনেছিলাম ছাত্রহিসাবে, ১৯২৬ সালে বরিশাল জেলার নলচিড়া গ্রামে যুব-সম্মেলনে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন দত্তের মুখে। একদা নির্বাসিত পুরনো বিপ্লববাদী নেতা ডঃ ভূপেন দত্ত ইয়োরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ঘুরে ও মহান লেনিনের সঙ্গে দেখা করে, সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়ে তখন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। মজুর ও কৃষকের সংগঠিত শক্তিও ইতিপূর্বে আমি দেখি নি। ১৯২৮ সালের কলকাতা পার্কসার্কাস ময়দানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার মজুরের প্রথম সমাবেশ দেখেছিলুম। হিজলী ক্যাম্পে রাজবন্দীদের উপর নৃশংস-ভাবে গুলি চালাবার প্রতিবাদে প্রায় ৫ হাজার রেলওয়ে মজুর লালঝাণ্ডা নিয়ে খড়্গপুর থেকে মিছিল করে গুলির প্রতিবাদ জানাতে ক্যাম্পে এসেছিল। মজুরশ্রেণী ও লালঝাণ্ডার তাৎপর্য তখনও আমি বুঝি নি। তারপর ক্যাম্প ও জেলে কিছু কিছু কমিউনিস্টদের সাথে দেখাও হয়েছে, বইও কিছু কিছু পড়েছি। ১৯৩২ সালে পলাতক অবস্থায় চন্দননগরে আমার অতি প্রিয় পুরাতন বন্ধু অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ) আমাকে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেছিল। খুব সম্ভব আমিও তাকে বলেছিলুম, আমরাও তো সমাজে প্রতিটি মানুষের সমানাধিকার চাই, এই জন্যই তো স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তখন এই কথাগুলো বলেছি বিষয়টির মূলে না যেয়ে—স্বাভাবিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের আন্তরিকতা নিয়ে। ১৯৩৪ সালে আলীপুর জেলে কমিউনিস্ট নেতা শামসুল হুদা, দিল্লীর সমাজ-তন্ত্রী নেতা অজিত দাশগুপ্ত ও এলাহাবাদের দেবেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি আরো অনেক বন্ধুর সাথে দেখাও হয়েছে, কিছু কিছু মার্কসবাদী পুস্তকও সেখানে পড়েছি। ১৯৩৪ সালে আলীপুর জেলে রাজনৈতিক

বন্দীদের অনশনের সময় খিদিরপুরের ডক-মজুররা রাজনৈতিক বন্দীদের দাবীর সমর্থনে সভা করে একটি প্রস্তাবও পাস করেছিল। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্র-বাদের কথাটা ক্রমেই সোচ্চারে বলতে শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা ও মজুরশ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিতে কিছুটা সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ কম-বেশি আমাদের মনে দাগ কেটেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মার্কসবাদ তখনও আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে নি।

ভারতের রাজনীতি যখন চারদিক থেকে অন্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন, ব্যর্থতার ইতিহাস যখন রাজনৈতিক কর্মীদের মনে গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে, পশুর মতো এণ্ডারসনী নৃশংস নিষ্পেষণ জনগণকে যখন পিষে মারছে, চারিদিকে মধ্যবিত্ত গণজীবনে যখন চরম হতাশা বিরাজমান, তখন মজুর-কৃষক মেহনতী জনতার পক্ষে সমাজতন্ত্রের পথই যে একমাত্র মুক্তির পথ—এই চেতনা আমাদের মনেও উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

আন্দামানে বসে, একেবারে গোড়ার দিকে, বন্ধুদের সাহায্য না পেলেও বৈপ্লবিক জিদ নিয়ে অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই পড়াশুনা শুরু করলুম। প্রথম দিকে পড়াশুনার ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছে, চোখ দিয়ে জল ঝরেছে, মাথা গরম হয়ে গেছে, উধাও হয়েছে রাত্রের ঘুম; তবু প্রতিদিন উন্মাদের মতো পথের সন্ধানে ১২/১৪ ঘণ্টা করে পড়েছি। এই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট মতবাদ যে একটা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ছাত্রের মতোই যে একে অধ্যয়ন করতে হয় এবং জনগণের মাঝে কাজ করে এই বিজ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে হয়, বৈপ্লবিক তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ই যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ—তা ক্রমেই বুঝতে শিখলুম। মজুর ও মেহনতী জনতার মাঝে কাজ না করে, জনতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে, জনতাকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত

না করে, জনতার আপনজন না হয়ে, শুধু চাটুকারিতা আর বড় বড় সমাজতান্ত্রিক বুলি কপচিয়ে সমাজতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দ্বারা বা শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে কত বিপ্লবী বন্ধুকে যে সঠিক রাজনীতি থেকে অনেক দূরে ভেসে যেতে দেখেছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

আজকের দিনে সমাজতন্ত্র বুঝবার ও এগিয়ে যাবার যে সুযোগ এসে গেছে, সেই অতীত দিনগুলোতে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারত না। সবই ছিল নিষিদ্ধ ও বে-আইনী। সোভিয়েত ছিল 'নিষিদ্ধ দেশ ও নিষিদ্ধ কথা'। সেই নির্মম পীড়াদায়ক দিনগুলোতে আমারই পাশে ছিল সুনীলদা-র (চ্যাটার্জী) সেল। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনায় তাঁর কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তিনি ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং তখন পর্যন্ত উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী। এমন মেধাবী এবং বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনাওয়ালা বন্ধু ক্যাম্পে ও জেলে আমরা খুব কমই দেখেছি। তিনি বলতেন, 'আমি মার্কসবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করে ছাড়ব।' জেলের সর্বত্র তিনি চিৎকার করে বলতেন, 'কমিউনিজম ভুল। ভারতীয় দর্শন সঠিক।' শেষপর্যন্ত কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে হঠাৎ তিনিও একদিন কমিউনিস্ট হিসাবে বেরিয়ে এলেন। পরিশেষে একদিন ঘোষণা করলেন, 'মানবমুক্তির একমাত্র পথ হলো—বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ—কমিউনিজম'। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, গভীর ও আন্তরিকভাবে পড়াশুনা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো: (১) কি কি বিষয়ে পড়াশুনা করব এবং (২) কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়াশুনা করব তা স্থির করা।

দৃষ্টিভঙ্গীগত এই সমস্যার একদিকে রয়েছে কায়েমী স্বার্থে ধনিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে পড়াশুনা করা, যার মূল কথা হলো—জমিদার, বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণীর শাসন-শোষণ স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী এবং ধর্ম, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি শাশ্বত

ও চিরন্তন, এটা প্রতিপন্ন করা।

অপর দিকে, গরিব মেহনতী জনতা ও মজুরশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ, আমরা কোন শ্রেণীর লোক এবং কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি? শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মানুষ কোনো-না-কোনো শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলেছে, সুতরাং আমরা কাদের স্বার্থে কাজ করি, কাদের স্বার্থে কথা বলি সে-সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

পড়াশুনা করার ব্যাপারে এই দুটো বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছিলুম। গরিবের উপর শোষণ ও জুলুম চিরস্থায়ী, শাশ্বত আর চিরন্তন—এটা ভগবানের ইচ্ছায় বা পূর্বজন্মের পাপের জন্য হচ্ছে, এই যে কায়েমী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী, আমরা কি সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই সমস্ত প্রশ্নকে বিচার করব? অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকবই—এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলে শেষপর্যন্ত কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। তাই ঠিক করলুম, খোলামন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু বিচার করতে হবে। সমস্ত ঘটনার ভিতর থেকে খুঁজে বের করতে হবে কার্য ও কারণ এবং পরস্পর সম্পর্ক। প্রতিটি জিজ্ঞাসার যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক উত্তর পেতেই হবে, এই ছিল মনোভাব।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটাও বুঝেছিলাম যে, অনেক বন্ধু জীবনে বিস্তর বইপত্র পড়াশুনা করেন বটে, কিন্তু যাকে অধ্যয়ন করা বলে তা করেন না। অর্থাৎ, কোনো বিষয়ের মূলে তাঁরা প্রবেশ করেন না। মৌলিক পড়াশুনা না থাকার জন্য পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের ক্রমবিকাশ, ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না, আত্মবিশ্বাসও জন্মে না। আমরা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মূল বিষয়ে পড়াশুনা না করে ভাসাভাসা ভাবে অনেক কিছু পড়ার পরও মূলত অজ্ঞই থেকে যেতে হয় এবং জীবনে প্রতিপদে হোঁচটই খেতে হয়। অবৈজ্ঞানিক

কায়দায় তাই যথেষ্ট পড়াশুনা করেও কোনো লাভ হয় না।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে, আমাদের বইপত্র খুবই কম ছিল। আজ তো দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ও চাঁদে যাওয়ার যুগ। সেই তিরিশের দশকের অন্ধকার যুগে গোটা ভারতবর্ষে মার্কসবাদী বই বে-আইনী ভাবে ২/১ খানাই মাত্র আসত। এই সমস্ত বই গোপনে সুদূর আন্দামান জেলে নিয়ে পড়াশুনা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তবু আমরা কিছু কিছু বই গোপনে সংগ্রহ করে পড়েছিলুম। আমরা কিভাবে পড়েছি তারই ছোট একটি ছবি অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরছি। এই পাঠ্য-বিষয়গুলির মধ্য দিয়েই পরিচয় পাওয়া যাবে আমাদের দিবারাত্রি ব্যাপ্ত জীবনের তরঙ্গিত ধ্যান-ধারণা-গুলির কথা।

আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে গভীর ভাবে পড়াশুনা করতে হলে প্রথমেই পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকে আমাদের ধ্যান-ধারণায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পৃথিবীর জন্ম সম্পর্কে কতই না অবৈজ্ঞানিক প্রভাব আর বক্তব্য ঘোষিত হয়েছে। এজন্যেই পৃথিবীর ঠিকানা সম্পর্কে যতগুলো বই পেলুম তা একে একে পড়ে নিলুম। সেদিন সব কথা যে বুঝেছি তাও নয়। দেখলুম, বৈজ্ঞানিকদের মাঝেও কমবেশি মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও একটা কথা পরিষ্কার বুঝলুম, অশরীরী কোনো শক্তি পৃথিবীকে সৃষ্টি করে নি। প্রকৃতির জগতে সবকিছু চলমান ও পরিবর্তনশীল, এটাই নিয়ম। এই কার্যকারণের জন্যই সূর্য বা ধূলিকণা থেকে একদিন এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে।

সেই অগ্নিকুণ্ড বা উত্তপ্ত পৃথিবীতে সেদিন জীবন বলে কিছু ছিল না, থাকতেও পারে না। এই পৃথিবীকে কেউ সৃষ্টি করে দিয়েছে বা চেতনাই মুখ্য—এই কথার কোনো বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। যেখানে জীবনের অস্তিত্বই ছিল না, সেখানে চেতনা আসবে কোথা থেকে ? কোটি কোটি বছর ধরে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েছে,

শীতল হয়েছে এই পৃথিবী, এসেছে জীবনের স্পন্দন। তারপরেই তো সৃষ্টি হয়েছে জীবনকোষ—শেওলা গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, পশুপাখি। এসেছে মানুষের পূর্বপুরুষ বা এই জাতীয় জীব—শিম্পাঞ্জী, গরিলা আর বন্যমানুষ।

অতীতের সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মগ্রন্থের ঘোষণাকে অস্বীকার করে সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—এই বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোপারনিকাস এবং সর্বশেষে গ্যালিলিওকে কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে!

একদিন আস্তে আস্তে এই পৃথিবীই শস্যশ্যামলা ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বর্বরমানুষ সভ্যমানুষে পরিণত হয়ে সৃষ্টি করেছে সমাজ ও ইতিহাস। মানুষের সনাতন ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দিয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাই শত শত শতাব্দীর অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

পৃথিবীতে কি করে জীবন এলো—এমিবা ও ক্ষুদ্রতম জীবকোষ থেকে কিভাবে এলো পশু-মানুষ এবং সেই পশু-মানুষ কি করে আজকের সভ্যমানুষে পরিণত হলো—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের গবেষণা এবং বিশেষ করে ডাঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত থেকেই তা আমরা জানতে পারলুম। মানবসমাজে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডারউইনের এই মতবাদ ধর্মান্ধদের নিকট থেকে সেদিন কতই না বাঁধা পেয়েছিল। ডারউইনের গবেষণা এবং তাঁর "অরিজিন অফ স্পিসিস" গ্রন্থের বিবর্তনবাদী বক্তব্য সত্যই মানবসভ্যতার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, ধর্মান্ধতা ও গোড়ামির বিরুদ্ধে এক চরম আঘাত। এখানেও আমরা দেখলুম, প্রকৃতির সাথে লড়াই করে মানুষ বাঁচার তাগিদেই পশু-স্তর থেকে সংগ্রাম করতে করতে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমানের শিল্প-বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়েই কিন্তু মানুষ প্রথম পৃথিবীতে আসে নি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, প্রকৃতিকে

বশে এনে জীবনধারণের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মাধ্যমে উৎপাদনী শক্তিকে বাড়িয়ে এই মানুষই বাস্তব জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছে এবং সাথে সাথে নিজেকে ও পরিবেশকে পরিবর্তন করেই আজকের মানুষ এত শক্তিশালী হয়েছে। ভগবান বা আল্লাহ আদম আর ইভকে পাঠিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে, এর মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এই মতবাদ স্বীকার করেন না। জন্ম-মৃত্যু, ধন-দৌলত, শোষণ, চুরি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যা কিছু ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে, সবই ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে—এগুলো অজ্ঞতা, ভয় আর কুসংস্কার এবং সর্বোপরি ধনিকের কায়েমীস্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজে প্রচলিত হয়ে এসেছে।

মানুষ ও পশুর পার্থক্য হলো: (১) মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি আছে এবং (২) হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষমতাসম্পন্ন পশুই মানুষ। কোনো কোনো পশুর কিছু বুদ্ধি থাকলেও তারা হাতিয়ার তৈরি করতে পারে না।

আন্দামান দ্বীপের সঙ্গে সেদিন যেটুকু পরিচয় হয়েছিল, তাতে সেখানে আদিম জীবনযাপনেরই প্রাধান্য দেখতে পেয়েছিলুম। চোখের সামনে এই প্রাগৈতিহাসিক যুগকে রেখে মানবসমাজের আদিকাণ্ড সম্বন্ধে লেখা বইগুলি বুঝতে পারা বোধহয় অনেক সহজই হয়েছিল।

আদিম যুগের মানুষ বর্বর ও অসভ্য বলে পরিচিত। এদের না ছিল ধর্ম, না ছিল রাষ্ট্র, না ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ, না ছিল সভ্যতা। ক্ষুধার তাড়নায় প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে ভয়, আতঙ্ক ও অজ্ঞতার মধ্যেই ডুবেছিল এরা। বাঁচার তাগিদেই জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো আদিম যুগের মানুষ। উৎপাদনের উপায়গুলো সমাজের অধিকারে থাকায় ফলসংগ্রহ, মাছধরা, শিকারকরা, সবই এরা দলবদ্ধভাবে

করে। নেংটিপরা বা নগ্ন মানুষ পশুপাখি পুড়িয়ে ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত। এই সমাজের যারা জিনিসপত্র সংগ্রহ করত তারাই ছিল উৎপাদনের মালিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। আমরা যখন দেখেছি তখন পর্যন্ত আন্দামানীরা আগুন জ্বালাতেও শেখে নি। পাছে আগুন চলে যায় এই ভয়ে তারা গাছ পুড়িয়ে জঙ্গলে ও পাথরে সর্বদা আগুন জ্বালিয়ে রেখে দিত।

বৈজ্ঞানিকরা এই ধরনের আদিম মানুষ আর প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কত মূল্যবান গবেষণা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্ল মার্কস-এর প্রিয় সাথী এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' বইটা পড়ে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলুম।

জোর করে ধরে নিয়ে আসা উলঙ্গ আন্দামানীদের আগে দেখেছি। এবার দেখলুম, কোট-প্যাণ্ট পরা এবং সুন্দর ইংরেজী বলে এমন এক আন্দামানীকে। আমাদের দেখেই সে সম্ভাষণ জানাল, Good morning—সুপ্রভাত। ইংরেজরা এই আন্দা-মানীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিলেতে পড়াশুনা শিখিয়েছে। বুঝা গেল, সুযোগ পেলে আজকের 'অসভ্য' 'বন্য' আন্দামানীরাও একদিন আমাদের মতো শিক্ষিত ও সভ্য হতে পারে। সকলে মিলে উৎ-পাদন করা এবং সকলে ভাগ করে খাওয়া, এটাই ছিল আদিম যুগের বিশেষত্ব। এই জন্যই এ-যুগকে বলা হয়েছে আদিম সাম্যবাদী যুগ। এই সমাজে শ্রেণীবিভাগ হয়নি এবং শ্রেণীগত শোষণও ছিল না। আল্লাহ বা ভগবান মানুষকে প্রথম দিন থেকেই সর্বজ্ঞানসম্পন্ন করে, ধনিক বা গরিব করে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে, এই সমস্ত আজগুবি বানানো গল্প সবই অজ্ঞতা, ভীতি ও অন্ধবিশ্বাস থেকে এসেছে। এর মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা ও অজ্ঞতা কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়ে পরিবর্তনশীল ও গতিশীল প্রকৃতি এবং মানবইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করে নি—মানুষই

ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। আদিম যুগের মানবসমাজ সম্পর্কে যতগুলো বই-পুস্তক পেলুম, সবই পড়ে ফেললুম। সদা বর্ধমান উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে সমাজে এলো সংকট; মানুষের জন্ম-বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের প্রয়োজন হলো আরো উন্নত ধরনের উৎপাদনের। আদিম যুগ ভেঙ্গে দেখা দিল নতুন যুগ, দাস-সভ্যতা।

ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই হাজির হয়েছিলুম আন্দামান কারাগারের নির্যাতনী চক্রে। আদিম মানুষকে বুঝতে তাই অসুবিধা হয়নি।

আমরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়েছি প্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন গ্রীক. রোম ও ব্যাবিলনিয়ান সভ্যতার ইতিহাস থেকেই জানতে পেরেছিলুম তৎকালীন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই ছিল প্রাধান্য। যে দাসের মালিক—সে-ই উৎপাদিত দ্রব্যেরও মালিক। এই ব্যবস্থায় যারা কাজ করে তারাও মনিবের সম্পত্তি। মনিব তার ইচ্ছামত দাসকে ক্রয়বিক্রয় এবং হত্যাও করতে পারে। দাস-মানুষ ও পশুতে কোনো তফাৎ ছিল না।

দাস-যুগের ইতিহাস—দাস ও দাস-প্রভুদের মধ্যে রক্তাক্ত শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। ধনী-দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, মালিক ও দাসদের মধ্যে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে। এসব সত্ত্বেও এই যুগেই পণ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি. বাজার, টাকা, ধর্ম প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। ভাষা, সাহিত্য. শিল্পকলা, গান-বাজনা, শিক্ষা প্রভৃতিরও উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন সভ্যতায় যুক্তি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে আইনেরও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস প্রভৃতির মতো মনীষীরা এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। দাস-প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে পদানত দাসদের বিদ্রোহ, স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ইতিহাসে আজও প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। যাহোক, এরপরেই এলো

দাস-যুগের অবক্ষয় এবং দাস-সভ্যতার ধ্বংস ও অবলুপ্তি। স্থান-কাল ও সেই যুগের সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করেই আমাদের বুঝতে হবে যে, উৎপাদন ব্যবস্থার এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্কই সেই যুগের অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত ছিল।

ইতিহাসের হাত ধরে এরপর আমরা জানতে পারলুম মধ্যযুগ—অর্থাৎ, সামন্তযুগের কথা। জানলুম, দাস-সমাজ ব্যবস্থার পতনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সমাজে কিভাবে আবির্ভূত হলো ভূমিদাস-প্রথা বা সামন্তযুগ। ব্রিটিশ বণিকরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তখন ভারতেও ছিল সামন্তবাদী প্রথার প্রাধান্য। এই যুগেরও বৈশিষ্ট্য হলো সামন্ত-প্রভু, রাজা, নবাব, জমিদার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক ও গরীব শ্রেণীর বিদ্রোহ।

আরব দেশে ইসলামিক যুগের ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। আরব-ইতিহাস বর্বর সমাজ ব্যবস্থা অতিক্রম করে বণিক-সভ্যতার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। আজকের দিনে আমরা যাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলি অতীতে তা অবশ্য কোনো দিনই আরব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে পৃথিবীর সব দেশের মতো এখানেও দাস ও গরিব মানুষ লড়াই করেছে নতুন সমাজের অগ্রগতির জন্যে।

ইয়োরোপে শিল্প-বিজ্ঞানের ও নতুন নতুন উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির মধ্য দিয়ে দেখা দিল এক নবজাগরণ। এরি ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, সাধারণ বিজ্ঞান ও যুক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘটলো অভূতপূর্ব অগ্রগতি।

আমরা মানুষ—আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্ব রয়েছে, যুক্তি-বিজ্ঞানের বাইরে কোনো জিনিসকে স্বীকার করব না—এটাই হলো নব-জাগরণের মূলমন্ত্র। ইয়োরোপ-ভূখণ্ডে সেদিন সামন্ততন্ত্রের বিরাট ধর্মীয় আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। প্যাপ্যাসি

আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঘটে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের বিদ্রোহ। শিল্পোৎপাদন বিকাশের জন্য নবজাগরিত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন ছিল বিদ্রোহের। এটাই ছিল তখন সেই সমাজের চাহিদা।

জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনে প্রটেস্টান্ট রিফরমেশন আন্দোলন ছিল মূলত বুর্জোয়া বিকাশের আন্দোলন, শিল্পবিকাশের ফলশ্রুতি। গির্জার একচ্ছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে লুথার এবং ক্যালভিনের বিদ্রোহ ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত এটা ছিল মধ্যযুগীয় সমাজ ভেঙ্গে বুর্জোয়া বিকাশের অভিব্যক্ত রূপ ; কৃষকদের বুর্জোয়া-সংস্কার আন্দোলনে সামিল করা, সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষকের বিদ্রোহ এবং তীব্র শ্রেণীসংগ্রামই এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই শেষপর্যন্ত আমরা দেখলুম ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্ম, বুর্জোয়া-সভ্যতার উন্মেষ, নতুন ও নানা রকমের শিল্পবিকাশ আর সমাজে পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী নতুন শ্রেণী—বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব এবং তাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। মানবইতিহাস তীব্র শ্রেণীসংগ্রামে সত্যিই মুখর হয়ে উঠল। শিল্প আর বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতির ফলে আমরা দেখলুম, হাজার হাজার মানুষের কাজ একটি মাত্র মেশিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। মোটের উপর মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। দেখা দিল ব্রিটিশ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব—শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, হেবিয়াস কর্পাস—ব্যক্তিস্বাধীনতার আন্দোলন, চার্টিস্ট মুভমেণ্ট, লুডাইট আন্দোলন (নৈরাজ্যবাদী কল-কারখানা ভাঙার আন্দোলন), ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সামন্ত ও বণিক-প্রভুত্ব উচ্ছেদ করে বিকাশমান শিল্প-বুর্জোয়ার প্রাধান্য।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলুম, 'সাম্য', 'মৈত্রী' ও 'স্বাধীনতা'র বাণীতে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে মহাবিপ্লব ; স্বৈরচারী, সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণী এবং গির্জার প্রভুত্বের অবসান ; বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক বিপ্লব—কৃষি-বিপ্লব—'লাঙ্গল যার জমি তার' শ্লোগান কার্যকরী করা ; গণবিপ্লবে ব্যাস্টিল কারাগারের পতন, বুর্বোন রাজ-বংশের ধ্বংস, কৃষকের হাতে জমি, শিল্প-বিকাশের সুযোগ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি।

আরও লক্ষ্য করা গেল, ইয়োরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ; ১৮৪৮ সালে ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনে মজুরশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট লীগের সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রকাশিত হলো মহান মার্কস ও এঙ্গেলস-লিখিত ঐতিহাসিক পুস্তক, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার।'

১৮৭১-৭২ সালে সংঘটিত হলো ফ্রান্সে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম ক্ষমতা দখল—প্যারি কমিউন এবং ৫০ হাজার শ্রমিককে হত্যা করে বুর্জোয়াদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্দখল।

১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্যে আমেরিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয় অর্জিত হলো, সেখানেও ঘটলো বুর্জোয়া বিপ্লব। আমেরিকায় ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বুর্জোয়া ও মজুরশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

১৮৮৬ সালে চিকাগোর হে মার্কেটে মজুরদের উপর গুলিবর্ষণের পরে আন্তর্জাতিক মে-দিবসের ঘোষণা ধনিকতন্ত্রের মৃত্যুবাণ হিসেবেই কাজ করে এসেছে।

ইতিহাস-পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা জানলুম, শিল্প-বিপ্লবের সীমাহীন অগ্রগতি, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোকে দখল ও শোষণ, উপনিবেশ স্থাপন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসম বিকাশ ও গভীর সংকট, দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির আপেক্ষিক বাড়তি উৎপাদনের সংকট, একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব, ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির চিরস্থায়ী চরম সংকট, সাম্রাজ্যবাদীদের দুনিয়াব্যাপী বাজার ভাগ-বাটোয়ারা—উপনিবেশ স্থাপন, পুনর্দখল ও পুনর্বন্টনের প্রচেষ্টা,

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধ, রুশ দেশের ১৯০৫ সালের প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব ও তার ব্যর্থতা এবং বল্কান যুদ্ধের কথা।

ইতিহাসের সঙ্গে চলতে চলতে আমরা জানলুম, সাম্রাজ্যবাদী যুগ হলো ধনতান্ত্রিক সমাজের চির সংকটের যুগ—একদিকে যুদ্ধ এবং অপরদিকে শ্রমিক-বিপ্লব ও ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগ। আর জানলুম, উপনিবেশ পুনর্দখলের জন্যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯) কিভাবে শুরু আর শেষ হলো তার ইতিবৃত্ত।

অতঃপর ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শান্তি, জমি, রুটি, গণতন্ত্র—এই ৪টি শ্লোগানের ভিত্তিতে রাশিয়ার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়যুক্ত হওয়ার কথা, সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ত-প্রভু জার-রাজতন্ত্রের ধ্বংস ও পতন এবং বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়ার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কিভাবে এলো তাও আমরা জানতে পারলুম।

অবশেষে শান্তি, জমি, রুটি, সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েতের হাতে সর্বময় ক্ষমতা—এই দাবিতে শ্রমিকশ্রেণী ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সর্বপ্রথম মানবসমাজে নভেম্বর সোশ্যালিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হলো, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সর্বপ্রথম মজুর-কৃষকের হাতে এলো স্থায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা। মানবসমাজে শোষণহীন শ্রেণী-হীন নতুন সমাজ গঠনের দ্বারও খুলে গেল।

আমরা সেদিন এইসব কথা জেনেছিলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক এবং বিশ্ববিখ্যাত ও ভারতখ্যাত ঐতিহাসিকদের নানা গ্রন্থ পাঠ করে। আন্দামানের বন্দী-পাঠাগারে এসব গ্রন্থ তখন প্রচুর পরিমাণে জমা হয়েছিল। আমরা তর্ক করে, গবেষণা করে, চার্ট করে সেদিন এইসব ইতিহাস পড়েছি। সব বইয়ের নাম এখন আর মনে নেই, তবে হেজেন, হেজেনমুন, এইচ. জি. ওয়েলস, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সারভেলঙ্কার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের

নানা গ্রন্থ যে আমরা পাঠ করেছিলুম তা বেশ মনে আছে।

যাহোক, নভেম্বর বিপ্লবের বিরাট প্রভাব পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছেছিল। একদিকে ধনতান্ত্রিক জার্মানি, হাঙ্গেরী, ইটালী প্রভৃতি দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে মজুরশ্রেণী সংগ্রাম শুরু করে, অপরদিকে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরাট অগ্রগতি ঘটে। ভারত, চীন, মিশর, তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে উত্তাল মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এই স্বাধীনতা-আন্দোলন সোভিয়েত জনগণের এবং সরকারের পরিপূর্ণ সমর্থনও পেতে শুরু করে।

ধর্মান্ধ গোঁড়া মুসলমানদের বিরাট প্রতিবাদ সত্ত্বেও নব্যতুর্কীর জন্মদাতা কামাল আতাতুর্ক মধ্যযুগীয় চরম দুর্নীতিপরায়ণ খলিফা-তন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়ান। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কামাল আতাতুর্ক সর্বদা মহান লেনিন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন।

আন্দামানে ইতিহাস-পাঠের মাধ্যমে তখন যতটুকু বুঝেছি তার থেকেই আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি টেনেছিলুম :

(ক) বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মস্তিষ্কে সমৃদ্ধ মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। প্রকৃতির নিয়মে বাঁচার তাগিদেই প্রতিটি জীবকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মানুষ সংগ্রামের ভেতর দিয়েই নতুন জীবন ও ইতিহাস সৃষ্টি করছে। আজও মানুষ প্রতিনিয়ত শিল্প-বিজ্ঞানের নতুন নতুন অগ্রগতি ঘটিয়ে এবং আবিষ্কারের দ্বারা মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। মানুষ হলো হাতিয়ার তৈরি করা জীব।

(খ) মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রামে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে এবং তা উন্নততর করে উৎপাদনী শক্তিকে বাড়িয়েছে ; উৎপাদনী শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের গুণ, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাও বাড়িয়ে চলেছে।

অজানাকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি মানুষ বাঁচার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছে।

অজ্ঞতা, ভয়, কুসংস্কার তাকে পিছু টানলেও মানুষ ক্রমেই উন্নততর জীবন ধারণের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতিকে সংযত রেখে, জয় করে—জল-স্থল আর অন্তরীক্ষে মানুষ শিল্প-বিজ্ঞানের সাহায্যে সবচেয়ে শক্তিমান জীবে পরিণত হয়েছে।

(গ) ইতিহাসে শাশ্বত, সনাতন বা চিরসত্য বলে কিছু নেই; ইতিহাস গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। ধূলিকণা থেকে সূর্য, পিঁপড়ে থেকে মানুষ—সবার মধ্যেই পরিবর্তন চলছে; সংঘাতের ভিতর দিয়ে নতুনের জন্ম হচ্ছে; আপাত স্থিতিশীল মনে হলেও তার মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলেছে। শাশ্বত বলে যদি কিছু থাকে তা হলো পরিবর্তনশীলতা ও গতিশীলতা—পুরাতন ধ্বংস হচ্ছে ও নতুন জন্ম নিচ্ছে। মানবসমাজে মেহনতী মানুষই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। ধনতান্ত্রিক যুগে মজুরশ্রেণীই প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

(ঘ) আদিম সাম্যবাদী যুগকে বাদ দিলে মানবইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামেরই ইতিহাস—শোষক ও শোষিত, ধনিক ও গরিবের, প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির সংগ্রামের ইতিহাস। দাস-প্রভু ও দাস, সামন্ত-প্রভু ও কৃষক, বুর্জোয়া আর শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের লড়াই চলছে। আজকের দুনিয়ায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীকে হয় প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া এর যেকোনো একটি পথকে বেছে নিতেই হবে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে মজুরশ্রেণীর লড়াই প্রাধান্য লাভ করেছে। ধনিক সমাজ-ব্যবস্থার চরম সংকটের দিনে প্রগতিশীল মধ্যবিত্তকে তাই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিতে হবে জীবন-মরণ সংগ্রামে। এছাড়া বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই।

(ঙ) ধনতান্ত্রিক সমাজে মজুরশ্রেণী মেহনতী কৃষকের সাথে মিলে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। সোশ্যালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মজুরশ্রেণী কোনো শ্রেণীকে শোষণ করে না।

সমস্ত উৎপাদনী শক্তিকে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে নয়, গোটা সমাজের কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করে। এই সমাজে খাদ্য, জীবিকা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সকলের জন্যেই পাবার পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গঠনের সাথে সাথে শ্রমিক-শ্রেণী যেমন নিজের মুক্তি আনে তেমনি সমস্ত মানবসমাজকেও শোষণমুক্ত করে। এখান থেকেই মানবসমাজের সত্যিকার নতুন ইতিহাস শুরু হয়।

ইতিহাস বলছে—মানবসভ্যতা বলছে, আপাত-দৃষ্টিতে শাসক-গোষ্ঠী ও শোষকগোষ্ঠীকে যত শক্তিশালীই মনে হোক, শোষিতের জয়, মেহনতী জনতার জয় এবং জুলুমশাহী শাসকগোষ্ঠীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বাস্তব জীবনধারায়, অর্থনৈতিক জীবনে, উৎপাদনী শক্তিতে, শিল্প-বিজ্ঞানে পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য, কৃষ্টি এবং জীবনধারারও পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তিত মানুষ ক্রমেই সক্রিয়ভাবে, সচেতন ও সংগঠিতভাবে, নতুন সমাজ গঠনের পথে সংগ্রামে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পুরাতন শাসক-গোষ্ঠী ও সমাজ-ব্যবস্থাকে বিপ্লবের বহ্নিতে ধ্বংস করছে, এটাই সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লব স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। জনতা কত তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে, নতুন সমাজ গড়বে তা নির্ভর করে সঠিক আদর্শ, নীতি ও কৌশলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সুসংবদ্ধ পেশাদার বিপ্লবী পার্টির উপর, সচেতনতা ও সংগঠনের উপর।

• পঠন-পাঠনের মাধ্যমে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আমাদের সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল ভারত থেকে গোপনে আনানো দুই-খানা বই। এই বই দু-খানা হলো এঙ্গেলস প্রণীত 'সমাজতন্ত্রবাদ—বৈজ্ঞানিক এবং কাল্পনিক' আর মার্কস-এঙ্গেলস প্রণীত 'সাম্যবাদীর ইস্তাহার' (ইংরাজী অনুবাদ)। সব কথা তখন পড়ে বুঝি নি। তবু এককথায় বলা চলে, বই দু-খানা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কী অসীম দূরদৃষ্টি, কী গভীর জ্ঞান আর সুদূর প্রসারী আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক

দৃষ্টিভঙ্গী ! গোটা মানবসমাজকে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা আমূল পরিবর্তিত করার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রথমে তাঁরাই তৈরি করেছেন। আগামী সমাজবিপ্লবের প্রধান শক্তি মজুরশ্রেণী, একথা তাঁরাই প্রমাণ করেছেন। ধর্মীয় আবিলতায় মধ্য-যুগীয় অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন পুরাতন সমাজ সবদিক থেকে ভাঙছে, বুর্জোয়া সমাজ বাড়ছে, তার মাঝেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে—নতুন সমাজ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সোশ্যালিস্ট সমাজের আগমনী শোনা যাচ্ছে। এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা কারো নেই। সমাজতন্ত্রবাদ ইউটোপিয়া বা অবাস্তব পরিকল্পনা নয়। এটা বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক, তাই এর নাম হয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। ইস্তাহারের শেষের অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছেঃ "আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণী কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ। দুনিয়ার মজুর এক হও!" [কমিউনিস্ট ইস্তাহার]

জার-সাম্রাজ্য হলো সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী একচ্ছত্র রাজতন্ত্র। ইয়োরোপ ও এশিয়ার সুদূর চীন, ইরান, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি জাতি ও উপজাতিগুলোকে পদানত করে রেখে বেয়নেট ও পশুশক্তির দ্বারা বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জার-শাসন জনগণকে শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে। এককথায় জার-সম্রাজ্য ছিল বিভিন্ন জাতির কারাগার।

জারের বিরুদ্ধে ডিসেম্ব্রিস্টদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, জার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর সন্ত্রাসবাদী ও নিহিলিস্টদের বার বার আক্রমণ, ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, জার পিটারের সময় ধনতন্ত্রের বিকাশ, বিপ্লবী মজুরশ্রেণীর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ,

অর্থনৈতিকতাবাদীদের জার-বিরোধী ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ, পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীদের দল নারোদনিকে, পপুলিস্ট এবং পরে রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং বুর্জোয়াদের দল ক্যাডেট পার্টি গঠন (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মার্কসবাদের ভিত্তিতে রুশদেশে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশদেশে মার্কসবাদ ও আন্তর্জাতিক মজুর আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন প্লেখানভ। তিনি ভাববাদী দর্শন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদর্শ-গত ভিত্তিকে চরম আঘাত করে বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখেন), লেনিনের নেতৃত্বে পার্টির ভিতর সংগ্রাম এবং বলশেভিক ও মেন-শেভিক পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কেও আমরা অবহিত হলাম। এই সময়টায় আমেরিকা থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী, লেনিন-বিরোধী বহু পুস্তক, পত্রিকা ও জীবনী আমাদের দেওয়া হলো। লেনিনকে দস্যু, নরহত্যাকারী, হৃদয়হীন ব্যক্তি বলে চিত্রিত করে তাঁর জীবনী লেখা হয়েছে। এমন একটি বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল—"God of the God-dess—Lenin". লেখকের নাম আজ আর মনে নেই।

আমরা দেখলুম, কমরেড লেনিন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরই পার্টিতে মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। আমাদের মতোই লেনিনের বড় ভাই সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী ছিলেন। জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র-মামলায় তাঁর দাদা আলেকজাণ্ডারের ফাঁসি হয়ে যায়। ছাত্র লেনিনের রাজনৈতিক জীবনে দাদার প্রভাব খুবই ছিল। দাদার ফাঁসির পর বেদনাহত হৃদয়ে তখনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "এই সমস্ত নারোদনিক সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের আত্মত্যাগ, বলিষ্ঠ চরিত্র, দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলাবোধ অতুলনীয়, এটা নিশ্চয় মার্কসবাদী বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু তাদের প্রদর্শিত পথ হলো ভুল। এই পথে জার-সাম্রাজ্যের পতন এবং জনগণের মুক্তি কিছুতেই আসতে পারে না। ব্যক্তিগত বীরত্ব দ্বারা

ইতিহাস তৈরি হয় না ; সমাজের মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে না। মজুরশ্রেণী ও মেহনতী কৃষক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন আসে।"

লেনিন পেত্রোগ্রাদে (বর্তমান নাম লেনিনগ্রাদ) এসে প্রথমেই মজুরশ্রেণীকে ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কর্মীদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। তিনি সকলকে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে বিপ্লবী দল ব্যতীত বিপ্লব অসম্ভব। তাই তিনি মজুরশ্রেণীর মাঝে জনতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে পেশাদার বিপ্লবী দল গঠন করতে নিরলসভাবে কাজে নামেন।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরাজয় ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় আমরা কমরেড লেনিনের জীবন থেকে এবং রুশ-বিপ্লব থেকে বহু মূল্যবান শিক্ষা পেতে পারি।

কমরেড লেনিন নির্বাসন দণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে দেখতে পান যে, পার্টির ভিতর তখন আদর্শগত বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এবং সাংগঠনিক অরাজকতা ও অনৈক্য চলছে। এই সংকট থেকে পার্টিকে উদ্ধারের জন্যে তিনি 'ইস্ক্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এই সময় পার্টির মধ্যে দুটি ধারা—(ক) মার্কস-বাদী বিপ্লবী ধারা ও (খ) পাতিবুর্জোয়া সুবিধাবাদী ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পার্টি-কংগ্রেসে বলশেভিক ও মেন-শেভিক—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীতে ও কার্যক্রমে পার্টি প্রায় দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৯০২ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পার্টির ভিতর এই ধরনের আদর্শগত ও নীতিগত সংঘাত ও দ্বন্দ্ব এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লবে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা পার্টিকে খুবই সুসংহত ও শক্তিশালী করে। এই সময়ের উপর লেনিনের লেখা তিনখানা বই পড়ে একদম মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সব কথা সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝেছি কিনা বলা

শক্ত। কারণ, জীবনভর অজস্র ব্যর্থতা ও ভুলের ভিতর দিয়েই তো চলেছি আমরা!

'What is to be done ?' বা 'কী করতে হবে ?'—এই বইটি লেখা শুরু হয়েছিল একটি প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটির নাম ছিল—"কোথা হতে শুরু করতে হবে।" এই বইটি ১৯০২ সালের মার্চ মাসে লেখা। আজও দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টির মূল ভিত্তি লেনিনের এই মূল্যবান বইটি। আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে এই বইটার মূল কথা এইভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ

(ক) বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হবে পার্টি, বৈপ্লবিক আদর্শ ও নীতি এবং সংগ্রামী কার্যক্রম না থাকলে বৈপ্লবিক পার্টি হতে পারে না। বৈপ্লবিক পার্টি না হলে বিপ্লবও জয়যুক্ত হতে পারে না।

(খ) শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক পার্টির থাকবে স্বাধীন ভূমিকা, স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, লেজুড় বৃত্তি নয়, অর্থনীতিবাদ নয়, সুবিধাবাদী 'বিপ্লবীবুলি' ও উগ্রতা নয়, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড নয়, সখের বিপ্লবী দল নয়, সংশোধনবাদী দল নয়—চাই পেশাদার বৈপ্লবিক পার্টি—যা হবে জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।

(গ) মজুরশ্রেণীর কর্মী পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে দল গঠন করতে হবে; বে-আইনী অবস্থায় পার্টির পরিমাণগত বৃদ্ধির উপর জোর নয়, জোর পড়বে গুণগত বৈপ্লবিক গুণাবলীর উপর। পার্টির কাজ প্ল্যান-মাফিক করো—সৃজনশীল কাজের উপর জোর দাও, সুশৃঙ্খল পার্টি গড়ে তোল, ঘটনার পিছু পিছু না চলে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হও।

(ঘ) প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে—জার-বিরোধী সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করো, '**Rear guard**' হয়ে অর্থাৎ পিছন থেকে **vanguard** হওয়ার, নাম কিনবার চেষ্টা করো না, অগ্রবাহিনী নাম দিও না; যারা গণতান্ত্রিক নয় তাঁরা কমিউনিস্ট হতে

পারে না ; বে-আইনী অবস্থায় গোপন পত্রিকা অত্যাবশ্যক, এই পত্রিকা প্রচার ও সংগঠনের কাজ করে। জনতাকে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করো, সচেতন করো, সুসংবদ্ধ করো।

'One step forward two steps back'—'এক কদম এগিয়ে দু-কদম পিছু হটা'—এই বইখানা ১৯০৪ সালের মে মাসে লেখা। এই বইটি লেখা হয়েছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভিতর পাতিবুর্জোয়া অরাজকতা ও বিশৃংখলার উপর। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদীরাও অন্ধভাবে শৃংখলা মেনে চলে—কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে চাই সচেতন, লৌহদৃঢ় শৃংখলা। প্রতিটি পার্টি সভ্যকে কোনো না কোনো ইউনিটের অধীনে—ইউনিটের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। পার্টি শৃংখলার মূল বিষয়বস্তু হলো—গণতান্ত্রিকতা ও কেন্দ্রিকতা। এককথায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এর বাইরে কোনো বৈপ্লবিক পার্টি হতে পারে না।

'Two tactics in the Social Democracy'—'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে দুটি কৌশল'—১৯০৬ সালের লেখা। এই বই-এর মূল কথা হলো : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কারা এবং কোন্ শ্রেণী নেতৃত্ব করবে?—মজুরশ্রেণী, না বুর্জোয়াশ্রেণী? লেনিনের কথা হলো—আজকের দিনে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে না। অতীতে বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব করেছে (১৭৮৯) কিন্তু সেই যুগ বাসী হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক জিনিস নয় ঠিকই, কিন্তু চীনের দেয়াল দিয়ে এই বিপ্লবকে পৃথক করা যায় না। মজুরশ্রেণী আজ বিরাট শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছে। তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সোশ্যালিস্ট বিপ্লবে উত্তরণ সম্ভবপর। এখানেই শ্রমিকশ্রেণীর গভীর দায়িত্ব—গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং সোশ্যালিস্ট বিপ্লবে উত্তরণ করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বপ্লবের মূল কথা হলো—রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল।

ক্ষমতা দখলের পার্টি হিসাবে পার্টিকে তৈরি ও উপযুক্ত করে তুলতে হবে। মেনশেভিক, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য সুবিধাবাদী পাতিবুর্জোয়া দলগুলোর কথা হলো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াদেরই নেতৃত্ব থাকবে—বুর্জোয়াদেরই পার্লামেন্টারি রাষ্ট্র হবে। লেনিন বললেন—শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এখানেই লেনিনের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য। এই বইটিতে এই দুইটি কৌশল বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এই বইগুলো পড়ে বুঝলুম, কী গভীর বৈপ্লবিক দূরদৃষ্টি ছিল কমরেড লেনিনের! মানুষ, সমাজ ও শ্রেণী সম্পর্কে কী স্বচ্ছ ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী! গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করলুম, সামাজিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা সহজ কাজ নয়। এখানে সামান্যতম ফাঁকিরও স্থান নেই। বিপ্লবী মতাদর্শ, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা, জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত পেশাদার বিপ্লবী দল, এগুলো না থাকলে মার্কসবাদী পার্টি হয় না, বর্তমান যুগে কোনো দেশে বিপ্লবও জয়যুক্ত হতে পারে না এবং সৈন্যবাহিনী পুলিশ, আমলাতন্ত্র, প্রশাসনিক ও কায়েমী স্বার্থের সামাজিক ভিত্তিকে চূর্ণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করা যায় না। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যদ্বারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে বিপ্লব হতে পারে না। কমরেড লেনিনের এই সমস্ত লেখা আমাকে চমৎকৃত করে দিল। এই সমস্ত পড়ে নিজেদের আর বিপ্লবী মনে করার কোনো কারণ ছিল না। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য জ্ঞান-সম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল।

১৯০৫ সালে বিপ্লবের উপর লেনিনের লেখাগুলো পড়ে খুবই ভালো লাগল। আনন্দে ও উৎসাহে মন ভরে গেল। মজুরশ্রেণী, ছাত্র আর মেহনতী জনতা রাস্তায় নেমেছে, ব্যারিকেড করেছে—কৃষক স্থানে স্থানে বিদ্রোহ করেছে—সৈন্যবাহিনী দোলায়মান। এই

পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের আহ্বান, আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে যেতে হবে। 'অস্ত্র ধরো না, বিপ্লব করো না'—প্লেখানভের এই সমস্ত কথা হলো বিপ্লবের প্রতি, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। স্বাভাবিকভাবে লেনিনের এই সমস্ত লেখাগুলো আমাদের মনকে প্রথম দিকে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে। মজুর, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী জনতার সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে দেশকে স্বাধীন এবং সমাজতান্ত্রিক করার প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ় করেছে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হলে বলশেভিক পার্টি সিদ্ধান্ত নিল—সুসংহতভাবে পিছু হটো,—সাবধানে চলো। জার-রাশিয়া সর্বদাই গণআন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য পোগ্রোম (ইহুদী নিধন), খ্রীষ্টান-মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়ে দিত। মজুর ইহুদীদের নিয়ে গঠিত একটি সাম্প্রদায়িক সোশ্যালিস্ট দল হলো বুণ্ড পার্টি। এই দলের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে বুণ্ড পার্টি সোশ্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টির সাথে যুক্ত থাকতে পারে না। এটাই পার্টির সিদ্ধান্ত।

১৯০৭-১২ সাল প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার যুগ। হাজার হাজার কর্মীকে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করে, গুলি করে হত্যা করে লাইট পোস্টে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। শত শত কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। কৃষকের ফসল, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নৃশংস অত্যাচারের সীমা নেই। সীমাহীন জুলুমে রাশিয়া কিছুদিনের জন্য অন্ধকারে চলে গেল। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত কর্মী পার্টি ত্যাগ করতে শুরু করল। পার্টির ভিতর একদল পার্টি উঠিয়ে দেবার কথা বললো। লেনিন বললেন: "এরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রতিনিধি।" অপর একদল উগ্র বামপন্থী আইনসঙ্গত কাজের সুযোগ নিতে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। লেনিন এদেরও সমালোচনা করলেন। আইন-

সঙ্গত ও বে-আইনী কাজের সমন্বয় সাধন করতে বললেন।

১৯১২-১৪—লেনা গোল্ড ফিল্ডে মজুরদের উপর গুলি বর্ষণ, ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট—দেশজোড়া নতুন আন্দোলন।

১৯১৪-১৭—প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শুরু, জার-রাশিয়ার মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান। বলশেভিক ডেপুটিরা পার্লামেণ্টে ঘোষণা করল ঃ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে রাশিয়ার মজুরশ্রেণী ও মেহনতী জনতার কোনো সম্পর্ক নেই। ডেপুটিদের গ্রেপ্তার ও কারাগারে প্রেরণ।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী—জার-রাশিয়ার সর্বফ্রণ্টে যুদ্ধে পরাজয় বরণ। অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয়। জনতার ঊর্ধমুখী গণ-আন্দোলন, সাধারণ ধর্মঘট, গণঅভ্যুত্থান, বিপ্লব, জারতন্ত্রের ধ্বংস। বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা। এই সরকার শান্তি, জমি, খাদ্য—জনতার কোনো দাবিই পূরণ করে নি, গণপরিষদ ডাকে নি, সোভিয়েতের হাতেও ক্ষমতা দেয় নি। বিদেশ থেকে লেনিনের আগমন—এপ্রিল থিসিস প্রদান, বলশেভিকদের সোশ্যালিস্ট বিপ্লব পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর—বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে প্রথম সার্থক সোশ্যালিস্ট বিপ্লব। অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার ঘোষণা। সোভিয়েতের হাতে সর্বময় ক্ষমতা।

বলশেভিক পার্টির ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, লিথোনিয়া, এস্তোনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা। অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তি।

প্রথম শ্রমিক-বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপ; সাম্রাজ্যবাদী দেশ

গুলোতে সোভিয়েতের সমর্থনে আন্দোলন ও ধর্মঘট; জার্মানি ও হাঙ্গেরীতে শ্রমিক-বিপ্লব।

রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ—প্রতিক্রিয়ার পরাজয়—নেপ (N. E. P.), অর্থাৎ, নতুন অর্থনৈতিক পলিসি ঘোষণা—লেনিনের মৃত্যু—প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য—বেকার সমস্যার সমাধান।

আমরা রুশ দেশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে পড়েছিলুম কিন্তু এখানে অতি সংক্ষেপে মূল ঘটনাগুলোরই উল্লেখ করা হলো মাত্র। আমাদের পড়ার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো—ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হয়ে কেমন করে রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশে শ্রমিক-বিপ্লব জয়যুক্ত হলো তা জানা। এর প্রধান কারণ হলো: (ক) সেসময় দুনিয়াব্যাপী সীমাহীন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সঙ্কটে সকল দেশ জড়িত থাকার জন্য প্রতিটি দেশেই কমবেশি বিপ্লবী সঙ্কট চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী জোট ও ব্যবস্থার মধ্যে রাশিয়াই ছিল দুর্বলতম স্থান। (খ) লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মতো পেশাদার মার্কসবাদী বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠেছিল, যারা ক্ষমতা দখলের যোগ্যতা রাখে। মূলত এই দুটি কারণের জন্যই রুশ দেশে শ্রমিক-বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক পুস্তকে লিখেছেন: "এই যুগটাই হলো সাম্রাজ্যবাদী চিরসঙ্কটের যুগ—সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের যুগ।" সুতরাং যে-সমস্ত দেশে বলশেভিক পার্টির মতো শক্তিশালী পার্টি আছে সেখানেই বিপ্লব জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনা। যদিও এই বইটা আমরা আন্দামানে পড়ি নি।

এরপর আবার আমরা নতুন করে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পড়া শুরু করলুম। এখানেও আমরা দেখতে পেলুম—আদিম যুগের অধিবাসীরা বর্বর ও অসভ্য যুগ অতিক্রম করে এসেছে।

প্রাচীন ভারতের আদিম অধিবাসী হলো দ্রাবিড়, কোল, ভীল সাঁওতাল, নাগা, গারো প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতিগুলো। মহেঞ্জোদড়ো

হরপ্পার মাটি খুঁড়ে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে সভ্যতা অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রগতি লাভ করেছিল। অনেক ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন, ঐ দুই জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার অজস্র নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এরপর এলো আর্যরা। মধ্য এশিয়া থেকে তারা নিয়ে এলো প্রায় একই রকম উৎপাদন ব্যবস্থা : চাষ-বাস, পশুপালন আর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন। শুরু হলো আর্য-অনার্যের সংঘাত আর যুদ্ধ।

আর্য, অনার্য, মোঙ্গল, টার্কি, দ্রাবিড় প্রভৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠল গঙ্গা নদীর তীরে নতুন সভ্যতা।

হিন্দু-সভ্যতা (সিন্ধুর নামানুসারে), হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার পরস্পর সংঘাতে ভারতীয় মধ্যযুগ শুরু হলো। আরব মধ্য-এশিয়া থেকে এলো মুসলিম সভ্যতা। এলো মোগল-পাঠান যুগ। এরা কোনো নতুন অর্থনীতির ভিত্তির উপর রচিত উচ্চতর সভ্যতা নিয়ে আসে নি। সেই একই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা—আচার-ব্যবহার, খাদ্য-খাবারে কিছু পরিবর্তন এলেও এর ফলে আমাদের মৌলিক-অর্থনৈতিক সেই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। সেই বর্বর এশিয়াটিক সমাজ-ব্যবস্থা ও গ্রাম্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা রয়েই গেল। অর্থাৎ, আমরা পেলুম সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা—সভ্যতার আলো-হাওয়া বর্জিত গ্রাম্য কূপমণ্ডুকতা আর জোর যার মুলুক তার ব্যবস্থা। পেলুম রাজায় বাদশায় যুদ্ধ, ভোগ-বিলাসে উশৃঙ্খল উন্মাদনা—স্বৈরাচারী একচ্ছত্র শাসন এবং গ্রাম্য সমাজের বর্বর অচলায়তন ব্যবস্থা। পেলুম শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে স্থবিরতা, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রথা—চরম পশ্চাৎপদতা।

পরবর্তীকালে এলো ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিক সভ্যতা। বিদেশী ইংরেজ বণিকেরা নিয়ে এলো প্রথমে পণ্য ও পরে শিল্প-সভ্যতা। ধনতান্ত্রিক শোষণ ও লুণ্ঠন শুরু হলো—প্রাচীন কুটির শিল্প সব ধ্বংস করা হলো, চললো লুণ্ঠন ও দস্যুতা।

পণ্য-সভ্যতার ধাক্কায় ভাঙতে শুরু করল পুরাতন মান্ধাতা আমলের গ্রাম্য এশিয়াটিক সভ্যতা—এলো ধনতান্ত্রিক শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে গোষ্ঠীবদ্ধ পুরনো অর্থনীতিও ভাঙতে শুরু করল।

নতুন নতুন পণ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যত বাড়তে শুরু করল গোষ্ঠীবদ্ধ পশ্চাৎপদ কূপমণ্ডুক জীবনধারা ততো ভাঙতে লাগল। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হতে শুরু করল। ইংরেজ বণিক রাজদণ্ডের মালিক হয়ে গেল। ভারতবাসীর উপর চললো নতুন কায়দায় সীমাহীন শোষণ, লুণ্ঠন ও দস্যুতা। ভারতকে শোষণ ও লুণ্ঠন করে বিলাতে গড়ে উঠল মাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি নতুন নতুন শিল্পনগরী।

অতঃপর ব্রিটিশ শাসনে ও শোষণে নিষ্পেষিত, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতে জাতীয় উন্মেষ শুরু হলো। কিছু কিছু আন্দোলনও দেখা দিল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ—প্রথম আজাদি সংগ্রাম, ১৮৪০-৬০ সালে নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওয়াহ্‌বি আন্দোলন প্রভৃতি একের পর এক কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হলো।

এই সমসাময়িক সময়ে ব্রিটেনে চলছিল শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব। সামন্ত-বণিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য কোণঠাসা করে এই সময় উদীয়মান বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেছে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই শিল্পবিপ্লব ও গণ-তন্ত্রের ঢেউ ভারতের মাটিতেও এসে লেগেছে। যুক্তি-বিজ্ঞানের আলোকে যুবসমাজ শিক্ষিত হবার চেষ্টা করেছে। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় গোঁড়ামিতে অন্ধ সমাজ প্রতি পদে যুক্তি-বিজ্ঞানের শিক্ষায় বাধাও সৃষ্টি করেছে।

ইতিমধ্যে ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এই আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিল।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ; কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষীরা সমাজ ও পরিবারের পরোয়া না করেই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। আধুনিক বাঙালী জাতির উন্মেষ তখন থেকেই শুরু হয়। এটাই ছিল যুব-বাঙলার বিদ্রোহ, বাঙালীর নবজাগরণ। মুসলিম সমাজ পুরাতন ধর্মীয় গোঁড়ামি কাটিয়ে তখনও যুক্তি-বিজ্ঞানের শিক্ষায় এগিয়ে আসে নি। তফ্‌সিল সম্প্রদায়ও কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও ধর্মীয় কুসংস্কার ছেড়ে শিক্ষার সুযোগ তখনও গ্রহণ করে নি। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা—সর্বক্ষেত্রেই তারা তখন পশ্চাৎপদ। বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম ও তফ্‌সিলদের অসম বিকাশ এই সময় থেকেই শুরু হয়। এই অসম বিকাশের জন্য প্রধানত দায়ী ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও ষড়যন্ত্র : "বিভক্ত রাখো ও শাসন করো" পলিসি। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের পশ্চাৎপদতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং বর্ণহিন্দু-দের সংকীর্ণতা প্রভৃতি—যা আজো আমাদের অগ্রগতিকে জগদ্দল পাথরের মতো প্রতি পদে পদে বাধা দিচ্ছে, তাও অংশত দায়ী ছিল। আমাদের সমাজ-জীবনের এই দুর্বলতাগুলো না বুঝলে আমরা পাক-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না। মূল সংকট কোথায় তা ধরতে পারব না।

বাঙলা, বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উন্মেষে ১৮৮৫ সালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো।

১৯০৫-৯ সাল—বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন—শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লববাদী দল গঠন এবং ক্ষুদিরাম আর কানাই-লালের যুগ।

১৯০৬ সাল—সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সামন্তবাদী ভূস্বামী ও ধনিক

নবাবদের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম।

১৯১৪-১৯ সাল—প্রথম মহাযুদ্ধ—যুদ্ধের সময় এবং শেষ ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কাল। বিপ্লববাদী দলগুলোর কর্মকাণ্ড আর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের প্রভাব এই সময়কার উল্লেখ্য ঘটনা।

১৯১৯ সাল—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড—ব্রিটিশের স্বায়ত্তশাসন প্রদানে অস্বীকৃতি। নতুন আন্দোলন—দেশব্যাপী নতুন জাগরণ।

১৯১৯-২৪ সাল—অসহযোগ খেলাফত আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ব্যর্থতা।

১৯৩০-৩৪সাল—আইন-অমান্য আর খাজনা-বন্ধ আন্দোলন এবং ব্যাপক বিপ্লববাদী আন্দোলন। আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য জনমনে গভীর নৈরাশ্যের সঞ্চার।

মোটের উপর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস আমরা যত পড়েছি এবং বুঝবার চেষ্টা করেছি ততই আমাদের বেদনাবোধ গভীরতর হয়েছে। আমাদের দেশ শিক্ষা ও বিজ্ঞানে চরম পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র। গোটা সমাজ অ-শিক্ষায় আর কু-শিক্ষায় ডুবে আছে। সমগ্র সমাজ—ভাষা, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণে বিভক্ত, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে তমসাচ্ছন্ন; আমরা শুধু হিন্দু-মুসলমান হিসাবেই বিভক্ত নই, হিন্দুর মধ্যেও রয়েছে বর্ণহিন্দু আর তফসিল। বর্ণহিন্দুর মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র আর তফসিলদের মাঝে আছে কুলীন, বৈরাগী। মুসলমানদের মাঝেও শিয়া, সুন্নী, কাদিয়ানী—এমনি নানা ভাগ আর বৈষম্য। সমাজের এই অজ্ঞতা ও অমানবিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে আমরা দম্ভ করি, দাঙ্গা করি এবং মানুষকে হত্যা করে কখনো কখনো গর্বও অনুভব করি। দুনিয়ার মানুষ যে এক ও অভিন্ন, মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে মানুষ ও পশুতে যে কোনো পার্থক্য থাকে না তা আজও আমরা বুঝে উঠতে পারি নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

আমাদের সমাজের এই পশ্চাৎপদতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে "বিভক্ত রাখো ও শাসন করো"—এই পলিসির দ্বারাই বার বার জনতার মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশকে শাসন ও লুণ্ঠন করেছে। আজও আমাদের দেশের মূল সংকট এখানেই নিহিত রয়েছে। চীন, তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আন্দামানে যতটুকু সংগ্রহ করতে পারা গিয়েছিল আমরা তাও পড়ে ফেলেছিলুম।

এইভাবে ইতিহাসের পাঠ শেষ করে আমরা পড়া শুরু করলুম অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদি। প্রথমত চিরায়ত অর্থনীতি—এড্যাম স্মিথ ও রিকার্ডোর বই পড়লুম, পরে পড়লুম মার্কস-এর লেখা—'শ্রম, মজুরি ও মূলধন' এবং রুশ-লেখক বোগদান্‌ভ্‌ ও লিপিডাসের লেখা অর্থনীতির বই। শেষের দিকে লিয়নটিয়েভ-এর লেখা 'মার্কসীয় অর্থনীতি' বইটাও আমরা পড়েছিলুম। আমরা তর্ক-বিতর্ক করতে করতেই পড়েছি। দেখেছি, মার্কসীয় অর্থনীতি—বাস্তব ও সঠিক বলে কিনা জানি না—আমাদের নিকট অনেক সহজ মনে হয়েছে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পর্যন্ত দেখা যায় যে, মানুষের জীবনধারণের জন্যই উৎপাদন ও বিলি-ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল। এটাই অর্থনীতির মূল কথা এবং এই দুটির বিচার-বিশ্লেষণই অর্থনীতির মূল লক্ষ্য।

•স্বাভাবিক অর্থনীতি, হঠাৎ বিনিময় ও বর্ধিত বিনিময় থেকে জটিল পণ্য-সভ্যতা। একটি পণ্যের মধ্যেই ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য নিহিত। দ্বন্দ্ব ও মিলনের সমন্বয়ে কোটি কোটি পণ্য সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বন্দ্ব ও সংকট বাড়ছে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি—উদবৃত্ত মূল্য—শিল্প-পুঁজি থেকে ব্যাঙ্ক-পুঁজি—একচেটিয়া পুঁজিবাদ—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট—সাম্রাজ্যবাদী যুগ—অর্থনীতির চির সংকট—পৃথিবী ভাগ-বাঁটোয়ারা—বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

অপরদিকে সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের যুগ। সোশ্যালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার যুগ। সোশ্যালিস্ট বিপ্লব—সোশ্যালিস্ট অর্থনীতি—ব্যক্তিগত শোষণ ও মুনাফা লুট করার সুযোগের অবসান—সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেকার সমস্যার চির-অবসান।

প্রথমদিকে মার্কসীয় অর্থনীতি বুঝতে খুবই কষ্ট হয়েছে কিন্তু পরে দেখেছি, বুর্জোয়া অর্থনীতিই অনেক বেশি জটিল করে ও গোঁজামিল দিয়ে লেখা। ঐসব বইতে বুর্জোয়া শোষণ-ব্যবস্থা কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী—একথা বুঝাবার জন্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক বাজে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। একটু তুলনা করে পড়লেই দেখা যায়, মার্কসীয় অর্থনীতি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করেই বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানেই মার্কস-এর অবদান অপরিসীম।

অর্থনীতি পাঠের মধ্য দিয়ে দেখলুম, অর্থনীতির সঙ্গেই যুক্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি, উত্থান-পতন এবং তার ক্রমবিকাশ। নতুন উৎপাদনী শক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে, সমাজে দ্বন্দ্ব আসছে, সংঘাত বাড়ছে, আবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন পরিবর্তিত সমাজ জন্ম নিচ্ছে। দেখলুম, ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনী শক্তির সীমাহীন অগ্রগতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার কল্পনাতীত শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু এই সীমাহীন, অফুরন্ত শক্তি জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে সমাজের সকলের জন্য ব্যবহৃত হলেই সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং সমাজ থেকে অনাহার, অশিক্ষা, বিনা-চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাব সব শেষ করে দেওয়া যায়। এটা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতেই সম্ভবপর। এর নামই সমাজতন্ত্র।

এখানেই বুর্জোয়া ও মজুরশ্রেণীর দ্বন্দ্ব: এর মধ্যেই নিহিত দুনিয়ার সংকট। এই বিরাট উৎপাদনী শক্তি জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে, না ব্যক্তিগত শোষণ ও মুনাফা লুটবার কাজে

তা নিয়োজিত হবে? এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলেই আজ সমাজে বিপ্লব আসছে। একমাত্র বিপ্লব দ্বারাই পুরনো সমাজকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভবপর। একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে।

মার্কসীয় অর্থনীতি এত যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক যে অনেক বন্ধুকে মার্কসীয় দর্শন গ্রহণ না-করেই মার্কসীয় অর্থনীতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতেও দেখেছি।

যাহোক, অর্থনীতির পর দর্শন পড়া ঠিক করলুম। দর্শন হলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান—মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর। মার্কসবাদী বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো দর্শন। এখানে এসে অনেকেই হোঁচট খায়, পিছিয়ে পড়ে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা ত্যাগ করতে পারে না বলেই অনেক সময় এমনটা ঘটে।

ভারতীয় ও অন্যান্য দর্শনের যত বই পেলুম সবই পড়ে ফেললুম। এই বিষয়টিই সবচেয়ে কঠিন মনে হলো। দেখলুম, যত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তির জাল বিস্তার করেই বলি না কেন—দর্শনকে কিন্তু আমরা মূলত দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: (ক) ভাববাদী দর্শন (খ) বস্তুবাদী দর্শন। ভাববাদীরা একমাত্র চিন্তাকেই প্রধান্য দেয়—তাঁদের কথা হলো—কোনো অশরীরী শক্তি বা চিন্তাই সব কিছুর পরিবর্তনের মূল কারণ।

অপরদিকে বাস্তববাদীরা বলে—বস্তুই মুখ্য। পৃথিবীতে জীবজন্তু না আসার পূর্বেও বস্তু ছিল এবং বস্তু থাকবে। বস্তুই মুখ্য আর প্রধান। মানুষের মস্তিষ্ক—বিশেষ উচ্চ ধরনের বস্তু, যার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। মস্তিষ্ক বস্তুকে পরিবর্তন করে ও তা মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার ক্ষমতাও রাখে। বাস্তব জীবনের উৎপাদনী শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভাববাদী দর্শনের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে। এঁদের মধ্যে একদল

হলেন অজ্ঞ, গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ভাববাদী। তাঁরা মনে করেন যে, ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, মৃত্যু, চুরি, ধনদৌলত, ব্যভিচার—এমনকি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকার মৃত্যু থেকে শুরু করে যা কিছু পৃথিবীতে ঘটছে—সব কিছুই ভগবানেব বা আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া পাপ, অলঙ্ঘনীয় নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে; এই অবস্থা থেকে নিস্তারের কোনো উপায় নেই। বাস্তব জীবনে কিন্তু এঁরা শিল্প-বিজ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জন্মনিয়ন্ত্রণ, এ্যাটম, রকেট, এ্যারোপ্লেন, চাঁদে যাওয়া—মানুষের অকল্পনীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে জীবনকে গোঁজামিল দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন।

অপর দলটি কিন্তু বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। তাঁরা বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু বিজ্ঞান অনেক জেনেছে বা একদিন প্রায় সব কিছু জানতে পারবে, এটা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের ভিতর কেউ কেউ বলেন, আমরা যা জেনেছি তাও ঠিক জেনেছি কি না তা কে বলবে? (কাণ্ট)। এর মোক্ষম জবাব দিয়েছেন এঙ্গেলস। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, পরীক্ষা ও ব্যবহারের মধ্যেই সব জিনিসের পরিচয় নিহিত। পুডিং খাচ্ছ, না জুতোর চামড়া খাচ্ছ তা খেলেই টের পাবে। এঁরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সর্বশক্তিমান এক শক্তির উপাসক। এঁদের মাঝে একদল রয়েছেন যাঁরা সাহস করে একথা বলেন না—ভগবান বা সর্বশক্তিমান বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। তাঁরা বলেন, ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কোনো দরকার নেই। এই দুনিয়ায় যা পাচ্ছ তাকে উপভোগ করো, যা পাও নি সর্বশক্তি দিয়ে শিল্প-বিজ্ঞানের সাহায্যে তা পাবার চেষ্টা করো।

আমাদের মধ্যে একদম গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক তখন খুব কমই ছিল। তা সত্ত্বেও বলতেই হবে, আমরা সকলেই ছিলুম বিভিন্ন স্কুলের ভাববাদী দর্শনের উপাসক। জন্ম থেকে আমাদের

পারিপার্শ্বিকতায়, কাজ-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়—সর্বদিক থেকেই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য ছিল। আমরা ছিলুম ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সেই সমাজের সন্তান, যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও ধর্মীয় কুসংস্কার জটপাকিয়ে রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে বিপ্লবাদীরা গীতা, তুলসী ও কোরান হাতে নিয়ে ভগবান বা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করে বৈপ্লবিক জীবন শুরু করতেন। অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের সময় বরিশাল জেলে কোরান বুকে নিয়ে এক রাজবন্দীর মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু তিরিশের দশকে এ অবস্থা অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। যারা জেলে ধর্মীয় কাজ-কর্ম করতে চায় তাদের সামান্যতম অসুবিধা হোক এ কেউ কোনো সময় চায় নি বা কেউ তাতে কখনো বাধারও সৃষ্টি করে নি। ধর্ম হলো মানুষের মন্ময় জগতের প্রশ্ন। কারো বিবেককে, ধর্মমতকে তাই কখনো আঘাত করা হয় নি। এই আঘাত দ্বারা কোনো লাভও হয় না।

ধর্মের ব্যাপারে আমরা সে-সময় কতটা সংস্কারমুক্ত ছিলুম তা একটা ঘটনা বললেই বোঝা যাবে। ১৯২৮ সালে বিপ্লবীবীর বাঘা যতীনের মৃত্যু-বার্ষিকী দিবসে বরিশাল শহরে শঙ্করমঠের ছাদে রাত ২টার সময় আমরা গোপনে বসে বালেশ্বরের সংগ্রামী-দিবস পালন করছি। সেই দিনে একথা পুলিশ টের পেলে আমাদের রক্ষা ছিলনা। আমাদের সাথে ছিল একটি মুসলিম বন্ধু। হিন্দুমঠের ছাদের উপর বসে হিন্দু-মুসলিম একসাথে সভা করছি, এই সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ আমাদের মনে উদয়ই হয় নি। মুসলিমদের মধ্যে তখন বেশি ছেলে বিপ্লববাদী দলে আসে নি, আর বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলেও প্রধান কারণ হলো—তখনও মুসলিমদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ ভালোভাবে গড়ে ওঠেনি এবং শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বেকার-সমস্যাও প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। তা সত্ত্বেও আমরা কয়েকটি মুসলিম ছেলেকে দলে এনেছিলুম। জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার জন্য ১৯৩২ সালে একটি মুসলিম ছেলের উপরই দায়িত্ব পড়েছিল। শেষপর্যন্ত বিঘ্ন ঘটায় এই কাজটি হয় নি। আন্দামানেও আমাদের সঙ্গে কয়েকজন মুসলিম বন্ধু ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে যে ধর্মীয় সংস্কার ও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব ছিল, তা অস্বীকার করব না। এই সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের নিরন্তর চেষ্টা করতে হয়েছে।

অপরদিকে বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারীদের মধ্যেও দুটি স্কুল রয়েছে। যথা:

(১) যান্ত্রিক বস্তুবাদী—এঁরা মানুষেব চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উপর কম গুরুত্ব দেন। সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে দেখো, যান্ত্রিকভাবেই সব ঘটনা হচ্ছে ও হবে এটাই তাঁদের সিদ্ধান্ত। সর্বদিক দিয়ে ঘটনাকে বুঝে ও বিচার করে, কার্যকারণ খুঁজে এঁরা সিদ্ধান্তে পৌছান না। এই জন্যই এঁদের সিদ্ধান্ত এক রোখা—একপেশে হয়ে যায়।

(২) অপরদিকে রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শনের উপরই মার্কসবাদ দাঁড়িয়ে আছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে এখানেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর সীমাহীন অবদান। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের মূল কথা হলো:

ক) এই দর্শন যেমনি বস্তুবাদী, তেমনি দ্বন্দ্বমূলক।

খ) দুনিয়ার সবকিছু পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল।

গ) পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে গুণগত পরিবর্তন হয়। সমাজেব এই গুণগত পরিবর্তনের নামই সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ঘ) কোনো ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

ঙ) যা আজ, এখনো স্থিতিশীল মনে হচ্ছে, তার মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে—প্রতিটি জিনিস ও ঘটনার মধ্যেই 'হ্যাঁ' এবং 'না'-ধর্মী দ্বন্দ্ব রয়েছে। পুরাতন ধ্বংস হচ্ছে, নতুন জন্ম নিচ্ছে।

চ) এই দর্শন মস্তিষ্কের গুরুত্বকে, চেতনাকে কখনো এতটুকু ছোট করে দেখে না, চিন্তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে অপর বস্তুর সম্পর্ক দেখিয়ে দেয়।

ছ) মানুষ, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, কৃষ্টি এবং প্রতিটি জিনিস, ঘটনা আর বস্তুকে স্থান-কাল ও অবস্থার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই সেইভাবেই একে বিচার করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একেই বলে দ্বন্দ্বমূলক, সৃজনশীল মার্কসবাদ। মানব-সমাজ সম্পর্কিত এই দর্শনের নাম হলো "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা হলো : "মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব চৈতন্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, অপরপক্ষে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্য বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে।"—মার্কস

মানুষের জীবন-যাপনের রীতি যেমন, তার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাও হবে তেমন। সমাজের যে-সত্তা, জীবনযাত্রা পদ্ধতিব যে-ব্যবস্থা, সেই মাফিকই সেই সমাজের চিন্তা, মতবাদ. সাহিত্য, রাজ-নৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমাজ-বিকাশের ইতিহাস বলতে একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির উৎপাদকগণেরই ইতিহাস. শ্রমিক ও মেহনতী জনতার ইতিহাস বোঝায়। এই শ্রমিকরাই উৎপাদন রীতির প্রধান শক্তি। এরাই সমাজের অস্তিত্বের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন তা উৎপন্ন করে। "উৎপাদন শক্তির নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনেব সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের ও মানুষের চিন্তা-ধারার ভাঙন-গড়ন চলছে। সনাতন বলে যদি কিছু থাকে তা হলো গতিশীলতা।"—মার্কস।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সবই পরিবর্তনশীল। সেই সাহিত্যই চিরায়ত সাহিত্য বলে সমাজে বহুদিন টিকে থাকে—যা মানবিক মূল্যবোধ এবং মেহনতী জনতার জীবন-সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত। সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির ভিত্তিতে রচিত সমস্ত সাহিত্য কালের স্রোতে একদিন ধূলায় বিলীন হয়ে যায়।

আমরা এই সময় বুখারিন-এর লেখা 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বইটা পড়েছিলুম। বইটা পড়তে খুবই ভালো লেগেছিল। শুধু আমি নই, জেল ও ক্যাম্পে হাজার হাজার বিপ্লববাদী বন্দীকে এই বইটি কমিউনিজমের দিকে আকৃষ্ট করেছে। ঐ বইটিতে কি ভুলভ্রান্তি ছিল তখন আমাদের সীমিত মার্কসবাদী জ্ঞান দ্বারা তা বুঝতে পারি নি। এই বইটি পড়ার পরই বুঝলুম, আমরা বুর্জোয়া-সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য অবচেতনভাবে কাজ করে এসেছি। সত্যিকার বিপ্লবী তাকেই বলে যারা মানবসমাজ থেকে সমস্ত রকম শোষণ ও জুলুম শেষ করে দিতে চায়। এই অর্থে আমরা সত্যিকার বিপ্লবীও হয়ে উঠতে পারি নি। মজুরশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকের জন্য, অর্থাৎ সমাজের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষের জন্য স্বাধীনতা না পাওয়া গেলে সেই স্বাধীনতা কার জন্য ? সেই বিপ্লবই বা কার জন্য ?

এইসব ব্যাকুল প্রশ্নে আমার মতো অনেকেরই রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলুম, জনতার কল্যাণ, মুক্তি ও সত্যিকার স্বাধীনতা পেতে হলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। নিজেদের বিপ্লবী থাকতে হলে এটাই একমাত্র পথ। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদই একমাত্র পথ।

মোটকথা, নানা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমরা এইভাবেই খুঁজে পেলুম আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর :

(১) ইতিহাসকে কারা এগিয়ে নিয়ে যায়—কারা সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাস ? মেহনতী সংগ্রামী জনতা, মেহনতী মজুর-কৃষক, না কিছু বিপ্লবী বীর ও মহারথীরা ? বুর্জোয়া ভাববাদী ও পাতি-বুর্জোয়া চিন্তাধারা হলো : কয়েকজন বীর, মহাপুরুষ, মহারথী, রাজা-বাদশাহ্‌রা সৃষ্টি করে চলেছে মানবইতিহাস। আর জনতা শুধু ধারক আর বাহক হিসাবে তাদের অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই কথা স্বীকার করে না। নেতা ও নেতৃত্বের

গুরুত্ব রয়েছে ঠিকই কিন্তু সংগ্রামী জনতাকে বাদ দিয়ে নয়। আসল কথা হলো, ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলেই জনতা বীর ও নেতা সৃষ্টি করে। এখানে জনতাই মুখ্য, বীর আর মহারথীরা গৌণ। নিজেদের মন্ময় (Subjective) জগতে অতি-বিপ্লবী মনে করেই সন্ত্রাসবাদীরা মজুর-কৃষকের মাঝে কাজ করে না। মজুর-কৃষককে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সংগঠিত করে না। শাসক ও শোষক-গোষ্ঠীর কয়েকজন লোককে হত্যা করে সামাজিক বিপ্লব যে কিছুতেই জয়যুক্ত হতে পারে না, এই কথাটা তারা বুঝতে পারে না এবং চায় না। পুলিশ, মিলিটারী, আমলাতন্ত্র ও ধনিক শোষণ-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ষড়যন্ত্র করে দখল করা যায় না, দখল করলেও জনতার চেতনায় বিপ্লব না আসার জন্য এটা টিকেও থাকতে পারে না। এই জন্যই চাই মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে সচেতন বিপ্লব। ধনতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন, বীভৎস শোষণ ও জুলুম যত উলঙ্গ হচ্ছে, ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ততোই যে মজুরশ্রেণীকে আরো সচেতন, আরো সংগঠিত করার দায়িত্ব এসে হাজির হচ্ছে—এই কথা আমরা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লববাদীরা বুঝতে পারি নি। মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে বিচ্যুত মজুর-শ্রেণীর একজন হয়ে এবং ধৈর্য ধরে, সাহসের সঙ্গে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মজুরশ্রেণীকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য সচেতন করি নি। সহজে বাজিমাৎ করার পথ বেছে নিলেও এইরূপ সংগ্রাম দ্বারা মজুর ও কৃষকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী বিভ্রান্ত হয় ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম দুর্বল হয়। সমাজের আমূল বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য চাই—মজুর ও মেহনতী জনতার সচেতন ও জঙ্গী সংগ্রামে অংশগ্রহণ। বুদ্ধিজীবীদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হলো—শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে সচেতন না করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক দায়িত্ব নেবার জন্য তাদের সংগঠিত ও সচেতন না করে শুধু নেতা হয়ে থাকার প্রচেষ্টা; শ্রমিকরা তাঁদের কথা শুনে চলবে—এটাই তাঁদের চোখে শ্রমিক-নেতৃত্ব। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের তত্ত্ব তারা

বুঝতে চায় না। সমাজবিজ্ঞান এই শিক্ষা দেয় যে, কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের চিন্তা বা ইচ্ছামাফিক সমাজের বিকাশ শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় না। সমাজের বাস্তব জীবনের কতখানি বিকাশ হলো, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন কতটা এগিয়েছে—বিভিন্ন শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উপরই তা নির্ভর করে। মার্কসবাদের কথা হলো: "চিন্তাধারা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ণয় করে না। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই তাঁদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে।" যারা নির্ভুলভাবে সমাজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির কথা প্রকাশ করে, দূরদৃষ্টি নিয়ে পূর্ব থেকে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়, তারাই সমাজে নেতা ও বীর বলে পরিগণিত হয়। বীর ও মহারথীরা ইতিহাস সৃষ্টি করে না, ইতিহাসই বীর সৃষ্টি করে। জনশক্তিই মহাত্মাদের সৃষ্টি করে এবং মানব-ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুতরাং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে বিপ্লববাদীরা বীর, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক হলেও ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম এই সন্ত্রাসবাদী পথে জয়যুক্ত হতে পারে না।

হাজার হাজার লোকের সন্ত্রাসবাদী পন্থার দ্বারা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হয় না, বিপ্লব জয়যুক্ত হয় না। সন্ত্রাসবাদী খুন-খারাবী ও ধ্বংসমূলক কর্মকাণ্ড এককভাবে কিংবা একান্তভাবে সমাজে বিপ্লবও আনতে পারে না। তবে জনতার বিপ্লব শুরু হলে কখনো কখনো ধ্বংসমূলক কর্মকাণ্ড ও সন্ত্রাসবাদী কাজ বিপ্লবের সহায়তা করতে পারে। ঐ সমস্ত কাজ তখন বিপ্লবের সহায়তাকারী কাজ বলেই গণ্য হয়। এই নির্মম, সঠিক, পরিষ্কার কথাটা আমাদের বুঝতে হলো। অনেক বন্ধুই এই কথাটা পরিষ্কারভাবে সেইদিন বোঝেন নি বলে বারংবার রাজনৈতিক জীবনে সংকটে পড়েছেন, হোঁচট খেয়েছেন। একদিন বীর, দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করলেও আজ তারা পিছিয়ে পড়েছেন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—মজুর ও কৃষকশ্রেণী তো গরিব, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনার জন্যে তারা কোথায় অর্থ পাবে? লেনিনের নির্দেশমত মধ্যবিত্ত কর্মীরা শ্রেণী-বিচ্যুত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আপনজন, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পেশাদার বিপ্লবী হয়ে গেলেও অর্থ কোথা থেকে পাওয়া যাবে? ধনিকের টাকা লুণ্ঠন ও ডাকাতি করা ছাড়া উপায় কী? আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হলো। হিসাব করে দেখা গেল—১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ৩০ বছরে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লববাদীরা ডাকাতি যত টাকা সংগ্রহ করেছে, তার থেকেও অনেক বেশি টাকা বিপ্লবীরা এক বছরে সংগ্রহ করতে পারে, যদি মাসে চার আনা করে পয়সা করে মজুরশ্রেণীর নিকট থেকে আদায় করে। হিসাবে দেখা যায়, তখন যদি তিরিশ লক্ষ সংগঠিত মজুর ভারতে থেকে থাকে এবং তার মধ্যে কুড়ি লক্ষ লোককেও যদি ট্রেড ইউনিয়নের ভিতর গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে সংগঠিত করা যায়, তাহলে মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব। অর্থাৎ, এইভাবে বছরে সংগৃহীত হতে পারে ষাট লক্ষ টাকা।

রেলওয়ে, জাহাজ, কাপড়, পাট, কয়লা, বিদ্যুৎ, জল-সরবরাহ, বিভিন্ন কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি গোটা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মজুরশ্রেণীই পরিচালনা করছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে এরাই অচল করে দিতে পারে। সুতরাং আমরা কিসের উপব জোর দেব? কর্মী ও মজুরদের মধ্যে মার্কসবাদী রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের উপরেই প্রধান জোর দিতে হবে। মজুরশ্রেণী, কৃষকসমাজ একবার সচেতনভাবে সংগঠিত হলে অনেক প্রশ্নেরই সুমীমাংসা হয়ে যায়। অর্থের অভাবও কমে যায়। মজুরশ্রেণীর মার্কসবাদী সচেতনতা, বৈপ্লবিক সংগঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর একতা বিপ্লবী সংগ্রামে জয়ের প্রথম চাবিকাঠি। সুতরাং ডাকাতি করে নয়, মজুরশ্রেণীর ত্যাগ ও দানের মাধ্যমেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

সেই ফেলে আসা নিষ্ঠুর, নির্মম আর অব্যক্ত বেদনায় সম্পৃক্ত দিন-গুলোতে আমরা কী ভাবে পড়াশুনো করেছি, কী নিয়ে চিন্তা ও তর্ক করেছি তার একটা অতি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আজ এখানে পরিবেশন করলুম মাত্র। তখনকার দিনের এই সংঘাত ও দ্বন্দ্বের বিবরণ জানা না থাকলে আগামী দিনগুলোতে আমাদের জীবনের ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের দিকটা এ-প্রজন্মের মানুষদের পক্ষে বোঝা সত্যিই কষ্টকর হয়ে উঠবে।

নতুনতর সংঘবদ্ধ জীবনের সূচনা

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে আন্দামান-রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনে নতুন করে যেসব পরিবর্তন এলো, নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সকলেই তা বুঝতে আরম্ভ করল। আমরা স্পষ্ট বুঝলুম, রাজনৈতিকভাবে যত তীব্র মতপার্থক্যই থাক না কেন, জেল-জীবনে সংগ্রাম করে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ না থাকলে তা রক্ষা করা যাবে না। আরও সুযোগ-সুবিধা আদায় করা একমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম দ্বারাই সম্ভবপর। সুতরাং ঠিক হলো দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে সকলের সুবিধার জন্যই তিনটি কমিটি মারফৎ আমরা আমাদের জেল-জীবন পরিচালনা করব। এই কমিটিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) হাউস কমিটি ঃ দৈনন্দিন ও দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যে বন্দীদের অসুবিধাগুলো জেল-কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা এবং খাদ্য ও বন্দীদের প্রাপ্য জিনিসপত্র আদায় করার জন্যে গঠিত হয়েছিল হাউস কমিটি। এই কমিটির সদস্য ছিলেন ১১ জন রাজবন্দী।

(খ) লাইব্রেরি কমিটি ঃ এই কমিটির কাজ ছিল বিভিন্ন বন্দীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সমস্ত বইগুলোকে একত্রে জড়ো করে লাইব্রেরিতে নিয়ে আসা এবং ভারত গভর্নমেণ্ট ও বাঙলা গভর্নমেণ্টের নিকট থেকে লাইব্রেরি গ্র্যাণ্ট আদায় করা। লাইব্রেরি ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠল। গভর্নমেণ্টও বাঙলা, উর্দু, ইংরাজী, হিন্দী এবং পাঞ্জাবী ভাষায়

প্রকাশিত সরকার-সমর্থক সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠাতে লাগল। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান', 'ইণ্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স', 'কারেণ্ট হিস্ট্রি', 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বন্দীরা নিজেদের টাকায় আনতো।

আন্দামানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইংরাজীতে একটি ছোট দৈনিক বুলেটিন প্রকাশিত হতো, সেটাও পাবার ব্যবস্থা হলো। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেল থেকে আবদুল গফুর খান, শ্রীকৃষ্ণ সিং, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রফি আহম্মদ কিদোয়াই প্রভৃতি রাজবন্দীরাও আন্দামানে বন্দীদের জন্যে কিছু কিছু পুস্তক পাঠিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরাও বন্দীদের নামে বহু বই-পত্র জমা দিয়েছিলেন। এইভাবে সংগৃহীত কয়েক হাজার বইতে রাজবন্দীদের লাইব্রেরি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' এবং নজরুলের 'সঞ্চিতা'-র ৪০/৫০ কপি লাইব্রেরিতে এসে জমা হয়েছিল। ৭ জনকে নিয়েই লাইব্রেরি কমিটি গঠিত হলো। গোপাল আচার্য ও জয়দেব কাপুরকে দেওয়া হলো লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব।

(গ) খেলাধুলা কমিটি : রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা তখন ক্রমেই বাড়ছে। সুতরাং মাঠে খেলা ও ঘরে খেলার ব্যবস্থা করা এবং সরকার থেকে সর্বাধিক গ্রাণ্ট আদায় করাই এই কমিটির প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো। প্রায় ১০০ জন রাজনৈতিক বন্দী ও কয়েদী একসঙ্গে ১৫ দিন একনাগাড়ে কাজ করে মাঠের সমস্ত পাথর ও ইট সব তুলে ফেলে দিল। নতুন মাটি ফেলে নতুন দুর্বা ঘাস লাগিয়ে মাঠকে নতুন করে তৈরি করা হলো। মাঠও হলো পূর্বাপেক্ষা বড়। ফুটবলের মাঠ ব্যতীত বিভিন্ন ওয়ার্ডেরও ৪/৫টি মাঠ সংগ্রহ করা হলো। ফুটবলের খেলা বারো মাস। ভলি, ব্যাডমিণ্টন, রিং, হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়া বাঁধা, পিং-পং প্রভৃতি খেলারও ব্যবস্থা হলো। প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা থাকলো। সে-এক বিপুল উন্মাদনা। ঘরের

খেলা—তাস, পাশা, কেরাম, দাবা, লুডো—তারও আয়োজনে যেমন ত্রুটি ছিল না, তেমনি সব খেলাতেই প্রতিযোগিতা চালু রাখা হলো। প্রতিযোগিতা তীব্র হতে তীব্রতর হলো ফুটবল খেলার মাঠে। রাজনৈতিক বন্দীদের ৪টার পর একমাত্র গন্তব্যস্থল এবং সকলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো ফুটবল খেলার মাঠ। কত রকম, কত নামে যে প্রতিযোগিতা চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ফুটবল লীগ, এ-ডিভিশন ও বি-ডিভিশন আর সরাসরি খেলায় কাপ ও শিল্ডের ঘোষণা লেগেই ছিল। খেলা সবচেয়ে জমে উঠেছিল—যাবজ্জীবন দণ্ড-প্রাপ্ত (দাইমলী) বনাম অন্যান্য এবং শহীদ-শীল্ডের (মহাবীর, মোহন, মোহিতের স্মৃতিতে) উত্তেজনাকর প্রতিযোগিতায়। এই খেলায় সাধারণ কয়েদীরা বাজী পর্যন্ত ধরতো এবং বহু টাকার বাজী খেলা হতো। সাধারণ কয়েদীরা বাইরের থেকে দেয়াল টপকিয়ে এই খেলা দেখতে আসত। এই সমস্ত বড় খেলার রেফারী থাকতেন জেলার সাহেব।

আমাদের একটি রেফারী কমিটিও ছিল। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, খোকা রায়, গোপাল আচার্য, কালী রায় ও সুবোধ রায় ঐ কমিটিতে ছিলেন। বাইরে মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি দলের খেলায় যেমন উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দিত বন্দীজীবনে মনে হয় তার চেয়েও বেশি উত্তেজনা ছিল। একদিকে 'দাইমলী' টিমের সমর্থকদের নেতা যোগেন শুকুল ও সুখেন্দু দস্তিদারের মুখে হুঙ্কার উঠতো—"শালা লোগকো আজ কবর দেগা", অপরদিকে অন্য দলের নেতা অবনী ঘোষ, সুনির্মল সেন, প্রবীর গোঁসাই, পরিমল ঘোষ চিৎকার করে বলতো—"শালাদের এবার আর রক্ষা নাই।" এইসব খেলায় চিৎকার, মারপিট, ঘুষাঘুষি সবই চলত। কিন্তু খেলার মাঠ ত্যাগ করে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উত্তেজনারই শেষ। প্রথম দিকে 'দাইমলী' টিমের খেলোয়াড় ছিল : গোলে—অনন্ত সিং, ব্যাকে—লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ বা বিজয় সিং, হাফব্যাকে—ফণী নন্দী,

অনন্ত চক্রবর্তী, সুবোধ চৌধুরী, ফরওয়ার্ডে—বিনয় রায়, বিরাজ দে, নলিনী দাস। অপর দলের খেলোয়াড় ছিল: দীনেশ বণিক, উপেন সাহা, মন্মথ দত্ত, ধীরেন চৌধুরী, খোকা রায়, বঙ্কিম চক্রবর্তী, নগেন দেব প্রমুখ।

শেষোক্ত দলের অনেক খেলোয়াড় ক্রমেই মুক্তির জন্য ভারতে চলে গেল। নতুন করে এলো—অজয় সিং (গোলে), পূর্ণেন্দু গুহ, খুসিরাম মেহটা (ব্যাকে), নগেন দাশগুপ্ত (ফরওয়ার্ডে)। 'দাইমলী' টিম প্রায় ঠিকই রইল, হাফব্যাকে নতুন এলো হেম বক্সী, ফবওয়ার্ডে শক্তি সেন ও বিরাজ দেব। ৭ জনকে নিয়ে গঠিত এই খেলা-ধূলা কমিটিতে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন লোকনাথ বল এবং সেক্রেটারি নলিনী দাস।

বাজনৈতিক মতভেদের জন্য মনে মনে তিক্ততা বাড়ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দী জেল-কর্তৃপক্ষেব বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই আদায় করা সম্ভবপব হলো। উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়ে রাজনৈতিক বন্দীদেব দৈনন্দিন জীবনও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলো। তখনও ডিভিশন 'থ্রী' ও ডিভিশন 'টু'-র কিচেন পৃথক বয়েছে কিন্তু পূর্বের মতো কড়াকড়ি ছিল না। বন্দীরা এক কিচেন থেকে অন্য কিচেনে এসে মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়াও করেছে। সমুদ্রে মাছ বেশি ধবা পড়লে সেদিন একটা নিমন্ত্রণ-উৎসব একসাথে হযে যেত, যারা খুব অসুস্থ তাদের ডিভিশন 'টু'-র কিচেন থেকে কিছু কিছু ভালো খাবারের ব্যবস্থা হতো। প্রাতঃকালীন খাবার—চা ও খিচুড়ি ম্যানেজারেরা একস্থানে রান্না করে দুই ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিত। একমাত্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অপর কোনো সাহেব আসার সময়ে এবং কাজের সময়টাতে সকলকেই ওয়ার্ডে থাকতে হতো। নারকেলের দড়ি পাকানোর কাজ রয়েছে বটে তবে কড়াকড়ি তখন অনেকখানিই শিথিল হয়েছে।

১৯৩৫ সালে আন্দামান-রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনে সুদূর-প্রসারী কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। ইতিপূর্বেই বেশ কিছু বন্ধু কমিউ-নিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে এই সিদ্ধান্তে এসে গেলুম যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশকে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করতে হলে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আমরা আরও বুঝলুম, গণ-বিপ্লবে পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের যেমন কোনো স্থান নেই, তেমনি শর্ট-কাটেরও কোনো স্থান নেই। জনগণের কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীন মুক্তিই যদি আমাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ হয়, মজুরশ্রেণী ও মেহনতী জনতার নতুন সমাজগঠন যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে আমাদের কমিউনিস্ট হতেই হবে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত পার্টিই ভারতীয় জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে, দেশকে স্বাধীন করে একটি সোশ্যালিস্ট সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। আর, একমাত্র এই মতাদর্শই জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজ থেকে দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, অনাহার, যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে পারে।

'যে-সমস্ত বন্ধুরা ইতিপূর্বেই নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিল সেই সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে নতুন বন্ধুদের সিদ্ধান্তের কথা নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের মতো আরও কিছু বন্ধু কমবেশি এই সিদ্ধান্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। পুরনো বন্ধুদের ও আমাদের সকলের চিন্তা হলো—সুদূর আন্দামানে বসে আমরা কি করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য ও শক্তিশালী করতে পারি। অথচ আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, আমরা অতীতে কেউ কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টি করি নি। আর, আমাদের মধ্যে তখন একজনও

পুরাতন কমিউনিস্ট কর্মী ছিল না। সেই সময় প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক চেতনা এবং মানবিক ও মার্কসবাদী তত্ত্বগত চেতনাই আমাদের অনেককে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়ে মার্কসবাদের ভিত্তিতে পেশাদার বিপ্লবীর মতো মজুর-কৃষক জনতার মধ্যে কাজ করতে আমরা কেউই তখন পরীক্ষিত সৈনিক নই।

ঠিক এই সময়, ১৯৩৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি, কলকাতা থেকে আর এক চালান রাজনৈতিক বন্দী সেলুলার জেলে এলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবকুমার দাস ও চিত্ত বিশ্বাস। এঁরা বহন করে নিয়ে এলেন আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলের দুই কমিউনিস্ট বন্দী—কমরেড আব্দুল হালিম ও কমরেড সরোজ মুখার্জির একখানা চিঠি এবং সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি ডকুমেণ্ট—'ড্রাফ্‌ট প্লাটফর্ম অফ এ্যাকশন' এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামূলক একটি প্রতিবেদন।

কমরেড হালিম ও সরোজ মুখার্জি সেলুলার জেলে বন্দী সকল কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন কমরেডদের কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা শাখার নামে আবেদন জানিয়ে বল্লেন যে, তাঁরা যেন জেলের অভ্যন্তরে সবাই একটি কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে সংঘবদ্ধ হয়ে বহির্জগতের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করে সম্মিলিত পড়াশুনার মাধ্যমে নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে সুশিক্ষিত করে তোলেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে নিজেদের প্রভাবকে ব্যাপক করে তোলেন।

এঁদের চিঠিতে আর একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল। সেটি হলো: আমরা ভিন্নমতের বন্দীরা যেন জেলের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের আক্রমণ ও আঘাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলি।

বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুদূর আন্দামানের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বন্দীদের যোগাযোগ প্রচেষ্টা এবার সার্থক হলো।

আমরা চিঠি পেয়ে আনন্দে ও উৎসাহে লাফালাফি শুরু করে দিলুম। জীবনে এই সর্বপ্রথম আসল বৈপ্লবিক কাজ পাওয়া গেছে—কমিউনিস্ট পার্টির কাজ। দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে-সোশ্যালিস্ট ও প্রগতিশীল মুক্তি-আন্দোলন দেশে দেশে চলছে আজ থেকে আমরাও হলুম তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর থেকে মহান গৌরব বিপ্লবী জীবনে ও মুক্তি-আন্দোলনে আর কী হতে পারে? আজকের দুনিয়ায় মুক্তি-আন্দোলনের বিরাট বিরাট জয় ও অগ্রগতির মাঝে দাঁড়িয়ে নতুন দিনের নবীন বন্ধুরা হয়তো আমাদের সেই দিনের আবেগের মূল্য সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না।

যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদে বহুদিন থেকে বিশ্বাসী হয়েছেন সেই সমস্ত বন্ধুকে নিয়ে প্রথমে গোপনে গোপনে বৈঠক করে নেওয়া হলো। বিভিন্ন গ্রুপে, চক্রে ও ব্যক্তিগতভাবে পড়াশুনা করে বন্ধুরা মার্কসবাদ গ্রহণ করেছেন। আমাদের মধ্যে মার্কসবাদী জ্ঞানেরও যথেষ্ট তারতম্য ছিল। বহু যুগ ধরে স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরনো বিপ্লববাদী দলগুলোর যথেষ্ট গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। সেই সমস্ত দল ও বন্ধুদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আজ এক নতুন আদর্শের ভিত্তিতে যাত্রা শুরু করতে হবে—এ বড় কঠিন কাজ। তাই বেশ কিছু বুঝেও অনেকে পুরনো পার্টি ছাড়তে চায় না, আবার পুরনো পার্টির সকলে মিলেই কমিউনিস্ট হবো, এমন অবাস্তব চিন্তাও বিদ্যমান ছিল। অতীতে যাঁরা একই সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাঁদের পারস্পরিক টানও যথেষ্ট রয়ে গেছে। কোনো কোনো বন্ধুর আদর্শের ভিত্তি দুর্বল থাকার জন্য নতুন পথে যাত্রার ভয় ও অনিশ্চয়তাও ছিল যথেষ্ট।

আমাদের কথা হলো—ভারতের স্বাধীনতার জন্যই, জনগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই এই সমস্ত বিপ্লববাদী দলগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সন্ত্রাসবাদী পথে, ব্যক্তিগত খুন-খারাবির পথে ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে না।

এই পথে জনগণ বিভ্রান্ত হয়, জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ হয় না, সংঘবদ্ধভাবে জনগণ বৈপ্লবিক সংগ্রামে এগিয়ে আসে না, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনগণের উপর সীমাহীন নির্মম নিষ্পেষণ করার সুযোগ পায়। একমাত্র মজুর-কৃষক, বুদ্ধিজীবী, জাতীয় বুর্জোয়া ও মেহনতী জনতার ঐক্যবদ্ধ সচেতন বৈপ্লবিক সংগ্রাম দ্বারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা সম্ভব। আজকের দুনিয়ায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়—একমাত্র সমাজতন্ত্রই মানুষের সমস্ত রকম অভাব-অভিযোগ, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবিকা, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারে। ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে ধনিকশ্রেণী জনতাকে শোষণের ও লুণ্ঠনের নিরঙ্কুশ অধিকার পাবে, গরিব মেহনতী জনতা চির দুঃখেই দিন অতিবাহিত করবে, তা হতেই পারে না। মজুর-কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মেহনতী জনতা—যারা হলো সমাজের ৯৫ ভাগ, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত স্বাধীনতার কোনো অর্থই হয় না। আজ যাঁরা জনতার এই মহান বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁরাই আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীর শহীদদের—ক্ষুদিরাম, আসফাকুল্লা, সূর্য সেনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। তাঁরাই হলেন আজকের দিনে সত্যিকার বিপ্লবী। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

বিপ্লবী জীবনের পালাবদল: নতুন পথে যাত্রা

এইভাবে আলাপ-আলোচনা, নানা শলা-পরামর্শের পর ঠিক করা হলো—আমরা যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছি এবং যারা ভবিষ্যতে মুক্তি পাবার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তারা একটি সংগঠনে সংগঠিত হব। এই সংগঠনের নাম হবে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন। আমরা সর্বক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ এবং কারাগারে কনসলিডেশনের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করব বলেও সিদ্ধান্ত নিলুম।

১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল আন্দামান সেলুলার জেলে গোপনে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন সংগঠিত করা ঠিক হলো এবং ১লা মে সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো। যে ৩৫ জন বন্ধু সেইদিন সর্বপ্রথমে কমিউনিস্ট বলে এই সংগঠনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন:

(১) নিরঞ্জন সেনগুপ্ত (২) ডাঃ নারায়ণ রায় (৩) হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ঘুটুদা) (৪) গোপাল আচার্য (৫) কালী চক্রবর্তী (৬) আনন্দ গুপ্ত (৭) লালমোহন সেন (৮) রণধীর দাশগুপ্ত (৯) বঙ্গেশ্বর রায় (১০) হরেকৃষ্ণ কোঙার (১১) রমেশ চ্যাটার্জী (১২) অনন্ত চক্রবর্তী (১৩) ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (১৪) শচীন করগুপ্ত (১৫) ননী দাশগুপ্ত (১৬) রবি নিয়োগী (১৭) বিজন সেন (১৮) বিজয়কুমার

সিং (১৯) জয়দেব কাপুর (২০) কমলনাথ তেওয়ারী (২১) শিব বর্মা (২২) বটুকেশ্বর দত্ত (২৩) ডাঃ গয়া প্রসাদ (২৪) কেদার শুকুল (২৫) যোগেন শুকুল (২৬) বিমল দাশগুপ্ত (২৭) হরিপদ চৌধুরী (২৮) অমলেন্দু বাগচী (২৯) কেশব চ্যাটার্জী (৩০) জগদানন্দ মুখার্জী (৩১) কুন্দনলাল গুপ্ত (৩২) চিত্ত বিশ্বাস (৩৩) দেবকুমার দাস (৩৪) নলিনী দাস (৩৫) ফকির সেন।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হবার পূর্বে কয়েকজন বন্ধুকে অসুস্থতা ও সাজা কমে যাওয়ার জন্য বাঙলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন :

(১) সিরাজুল হক (২) মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্ত (৩) ধরণী বিশ্বাস (৪) সুধাংশু দাশগুপ্ত (৫) মনোরঞ্জন গুহ (৭) বিধু গুহ (৮) সুশীল দাশগুপ্ত প্রমুখ।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন সংগঠিত হবার মাত্র ৫ দিন পরে কনসলিডেশন-এর উদ্যোগে সেলুলার জেলে প্রথম মে-দিবস পালিত হলো। সেদিন জেল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে খুব সকালে কনসলিডেশন-এর সদস্যবৃন্দ ছ-নম্বর ইয়ার্ডের তেতলায় একটি বড় সেল-এ একত্রিত হয়ে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও শপথপাঠের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক মহান দিবসটি পালন করে।

এরপর নতুন নতুন বন্ধুরা এসে কনসলিডেশন-এ যোগ দিয়েছেন, সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। শেষের দিকে আন্দামানে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী কনসলিডেশনের সঙ্গে কমবেশি যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বাহিনীর বিশ্বস্ত সৈনিক হবার পর আমাদের আনন্দ ও গৌরব আর ধরে না, গভীর দায়িত্ববোধও আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুললো।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হবার পর থেকেই রাজবন্দীদের পড়াশুনা, খেলাধুলা, রাজনৈতিক জীবন, কিচেন, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, নাটক, হাস্য-কৌতুক—সব কিছুই নতুন করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শুরু হলো। পরবর্তী বছরগুলোতে আন্দামান-রাজবন্দীদের জীবনধারা এই কনসলিডেশনকে কেন্দ্র করেই মূলত আলোড়িত হয়েছে।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হবার পরই রাজনৈতিকভাবে আন্দামানের বন্দীরা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে কমিউনিস্ট বন্দী, অন্যদিকে পুরনো বন্ধুদের অন্যান্য দল। উভয় দিকেই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো। আমরা শুধু ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নির্ভীক অগ্রদূত নই, আমরা দুনিয়াজোড়া মুক্তি-আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক, পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক-আন্দোলনের আমরা অবিচ্ছেদ্য অংশ—এই চেতনা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের সকলকে গর্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল করে তুললো। সমাজতান্ত্রিক নীতি ও চেতনাবোধ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের বহু দুর্বলতা, মনমরা ভাব ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করল। আমাদের কথাবার্তায় এবং দৈনন্দিন জীবন-পরিচালনায় এর প্রতিফলন শুরু হলো। এসব সত্ত্বেও আমাদের মজুর আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ার অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য আমরা নানারকম মারাত্মক ভুলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলুম।

প্রথমত, কার্যকরী কমিটির নাম কী হবে তাই নিয়েই আমরা ভুল করে বসলুম। আমরা বইতে পড়েছি—কেন্দ্রীয় কমিটি (C.C.), পলিটব্যুরো, কনট্রোল কমিশন, ইত্যাদি। আমরা প্রথমে এই নাম দিয়েই সংগঠন দাঁড় করালুম। পরে অবশ্য আমরা এই ভুলের সংশোধন করে নিয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলখানার সমস্ত সাধারণ কয়েদী, কালতু প্রভৃতির সঙ্গে মেলা-

মেশায় এবং ব্যবহারে আমাদের আমূল পরিবর্তন শুরু হলো। আমরা বুঝে ফেলেছি—চুরি-ডাকাতি, দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম—শোষণভিত্তিক ধনিক সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতির জন্য মূলত গরিব মানুষগুলো দায়ী নয়—দায়ী হলো এই শোষণভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এই সমস্ত লোকগুলো হলো ধনিক সমাজের শিকার। যতদূর সম্ভব এদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনাও মনুষ্যত্ব-বোধ জাগ্রত করাই আমাদের কাজ। আমরা মজুরশ্রেণীর নিজস্ব কর্মী হিসেবে তাই মধ্যবিত্ত অহমিকা নিয়ে কিছুতেই এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারি না।

এই সময় আন্দামানে প্রতি মাসেই কিছু কিছু নতুন পি. আই, অর্থাৎ রাজবন্দী আসছে। তখন ১৩০ জনের মধ্যে ২০ জনের মতো ছিল ডিভিশন 'টু'-র বন্দী, যারা কিছুটা ভালো খাবার পেত। আমরা ঠিক করলুম, কিচেনকে এক করে ফেলতে হবে। সেইভাবে হাউস কমিটি ও ম্যানেজারেরা চেষ্টা শুরু করল। প্রথমে পরস্পর নিমন্ত্রণ, এক কিচেনে ভাত অপর কিচেনে ডাল ও তরি-তরকারী রান্না, এমনি করে চলতে চলতে এবং জেল-কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে দিতে একদিন কিচেন এক হয়ে গেল। ঠিক করে নেওয়া হলো, ডিভিশন 'টু'-র কারো আপত্তি থাকলে তার খাবারটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। একটি কিচেন থাকলে ৪টি সুবিধা: (১) খাবারের মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হবে (২) ম্যানেজারের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া যাবে—এর ফলে কয়েকজন বন্ধু পড়াশুনা করার নতুন সুযোগ পাবে (৩) জেল-কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ পাবে না (৪) নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা—ভোরের খাবার ঠিক সাড়ে ৭টায় শেষ ও দুপুরের খাবার ঠিক ১টায় শেষ হবে। ঘড়ি দেখে ম্যানেজারদের এই কাজগুলো পালন করতে হতো, কারণ পড়াশুনা ও ক্লাসগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। রাতের খাবারের জন্য যত দেরি করানো যায় ততই ম্যানেজারের কৃতিত্ব, আর বন্ধুদের

আনন্দ। কারণ, তাহলে লক-আপ দেরিতে হবে, বন্দীরা নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই সুন্দর পৃথিবীকে, চাঁদকে হয়ত একটু বেশিক্ষণ দেখতে পাবে।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠনের পর রাজবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নের বিরাট ব্যবস্থা সংগঠিত করা। কনসলিডেশন ঠিক করে নিল—আন্দামান সেলুলার জেলকে বিপ্লবী নিকেতন, অর্থাৎ বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। শিক্ষা-কমিটি ঠিক করল, প্রতিটি কনসলিডেশন মেম্বারকে সাধ্যানুযায়ী বাধ্যতামূলক পড়াশুনা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে পড়তে হবে, ক্লাস করতে হবে, অপরকে পড়াবার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে।

এই কর্মসূচী অনুসারে সমস্ত কনসলিডেশন মেম্বারকে সাধারণ শিক্ষার জ্ঞান ও মানানুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে ফেলা হলো। (ক) প্রথম গ্রুপটি হলো—যারা ইংরাজী পড়াশুনা করে বোঝে এবং কিছুটা রাজনৈতিক পড়াশুনা আছে তাদের নিয়ে (খ) দ্বিতীয় গ্রুপ হলো—অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বা আরো বেশি যারা পড়েছে তাদের নিয়ে (গ) তৃতীয় গ্রুপ সংগঠিত হলো—বাঙলা পড়তে ও বুঝতে পারে এমন বন্দীদের নিয়ে (ঘ) চতুর্থ গ্রুপে ছিল—একদম অক্ষর জ্ঞান নেই, থাকলেও অতি সামান্য, এমন সব রাজবন্দী। ঠিক হয়েছিল, এখানে সকলকে কঠোর ও সচেতন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে—প্রত্যেক গ্রুপের দায়িত্ব থাকবে একজন শিক্ষকের উপর, শিক্ষক ও ছাত্র সবাইকে ঠিক সময়ে ক্লাসে আসতে হবে, এই নিয়ম মেনে না চললে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে ও সাজা পেতে হবে। প্রতি ১৫ দিন পর পরই সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা চলত। কয়েকটি গ্রুপকে একত্রিত করে বিজ্ঞানের ক্লাস হতো। ৩নং ও ৪নং গ্রুপের বন্ধুদের সাধারণ ইতিহাস ও ভুগোল বুঝাবার জন্য বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ, স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনা

ধরে ক্লাস করা হতো। সবকিছু মিলে বন্ধুদের পড়াশুনার ঝোঁক সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেল। কিছু মার্কসবাদী পুস্তক গোপনে ভারত থেকে আনানো হলো। বেশি চাহিদা যে-সমস্ত বইয়ের তা তিন-চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হলো। এইভাবে একটি বই-এর অংশ প্রত্যেকে দুই ঘণ্টা করে পড়তে পেরেছে। এমনি করে প্রতিদিন একটি বই ২৫/৩০ জন বন্ধুও পড়েছে। সাধারণ লাইব্রেরি ছাড়া আমাদের একটি গোপন পার্টি লাইব্রেরিও করা হলো। ২ ঘণ্টা পরে কাকে এবং কোন সেলে বইটি দিতে হবে তা লাইব্রেরিয়ানই ঠিক করে দিত।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বৈকাল ১-৩০ মিঃ থেকে ৩-৩০ মিঃ —এই হলো আমাদের ক্লাসের সময়। 'রুশ-বিপ্লব' এবং 'অর্থনীতি'-র উপর আমাদের ক্লাস নিতেন নারায়ণদা। রুশ-বিপ্লবের উপর এক-মাত্র বই—ট্রটস্কির 'রাশিয়ান রেভলিউশন' তখন আমাদের নিকট ছিল। ট্রটস্কির লেখার ভুলভ্রান্তি তখন আমরা বিশেষ বুঝি নি। রাশিয়ার বুর্জোয়া-সমাজের চেহারাটা তিনি যেভাবে নগ্ন করে তুলে ধরেছিলেন তা আমাদের নিকট খুবই ভালো লেগেছিল।

মার্কস-এর লেখা 'ক্যাপিটাল' পড়ে আমরা সত্যই বোকা বনে গেলুম। এমন যুক্তিপূর্ণ দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণ আমাদের কাছে ছিল কল্পনাতীত। অর্থনীতির মতো একটি কঠিন রস-কসহীন বিষয়কে অতি সহজভাবে, একটি মাত্র পণ্য—কমোডিটি ধরে তার জন্ম, দ্বন্দ্ব, বিকাশ এবং সংঘাত—লক্ষ লক্ষ পণ্যের সৃষ্টি—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ—বিরোধ, সংকট ও ধ্বংস তিনি এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তা না পড়লে বুঝা যায় না।

কমরেড স্তালিনের লেখা 'লেনিনবাদের ভিত্তি'-র উপর ক্লাস নিতেন নিরঞ্জনদা। কী চমৎকার বই! আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেনিনবাদ কী তা বুঝবার চেষ্টা করেছি। দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে সোশ্যালিস্ট বিপ্লবে

এবং পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরস্পর-নিবিড় সম্পর্ক, বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলের গভীর গুরুত্ব, বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী-সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পেশাদার বিপ্লবী পার্টি ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আকাশ-কুসুম কল্পনা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী কার্যকলাপ, পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ ও উগ্র বামপন্থী ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে লেনিন-বাদের সংগ্রাম, বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার সহ প্রতিটি জাতির সম অধিকারের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানে লেনিনবাদের ভূমিকা আমরা বার বার পড়েছি।

আমরা হাতে লেখা দুটো কাগজও প্রকাশ শুরু করেছিলুম। একটা হলো "দুনিয়ার খবর"—ভারত ও বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে মজুর, কৃষক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের যে-সমস্ত সংবাদ আমরা পেতুম তাকে একত্রিত করেই শ্রমিকশ্রেণীর সমালোচনামূলক দৃষ্টি-কোণ থেকে প্রবন্ধ ও সংবাদ এতে প্রকাশ করা হতো। এখন বুঝতে পারি সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি। আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও আমরা ঐ পত্রিকা প্রতি ১৫ দিন অন্তর বের করতুম। বঙ্গেশ্বর রায়, রবি নিয়োগী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, ননী দাশগুপ্ত, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুরা পত্রিকার দায়িত্বে ছিল।

"দি কল" (The Call) পত্রিকা মাসে একবার প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকায় মার্কসবাদী তত্ত্বগত প্রশ্ন এবং যে-সমস্ত অমার্কসবাদী প্রশ্ন পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা তুলেছিল তার উত্তর যুক্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে দেওয়া হতো। ঐ পত্রিকার দায়িত্বে ছিল বিজয় সিং, জয়দেব কাপুর, শিব বর্মা, গোপাল আচার্য এবং পরে যুক্ত হয় সুনীল চ্যাটার্জী ও ধন্বন্তরীর নাম।

দুই তিন মাসের মধ্যে কনসলিডেশনের শক্তি আরো অনেক বেড়ে গেল। পুরাতন দলগুলো ভাঙছে—সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততাও বেড়ে যাচ্ছে। ভারত থেকে যে-সব নতুন নতুন বন্ধুরা আসছে তাদেরও কেউ কেউ এখানে পৌঁছেই কনসলিডেশনে যোগ দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে তখন চলছে পড়াশুনার বন্যা—এই বন্যায় সামিল না হয়ে কারো উপায় নেই। পুরনো দল রক্ষার জন্য কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধীরা শেষপর্যন্ত ঠিক করল যে, তারা কিচেন ভাগ করবে এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথাবার্তা, মেলামেশাও কমিয়ে দেবে। সাথে সাথে কয়েকদিনের মধ্যেই ৩টি কিচেন হয়ে গেল। এইভাবে (১) কমিউনিস্ট (২) যুগান্তর (৩) চট্টগ্রাম-মাদারিপুর-বি. ভি. গ্রুপ এক-একটি কিচেনে বিভক্ত হয়ে পড়ল। হাউস কমিটি এবং লাইব্রেরি কমিটিও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একমাত্র টিকে রইল অতি কষ্টে খেলাধূলা কমিটি। তখন রাজনৈতিক আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও তিক্ততা চরম রূপ নিয়েছে: এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বন্ধুকেই বলতে শুনেছি, খেলা-ধূলার মাঠটা না থাকলে আমরা অনেকেই পাগল হয়ে যেতুম। খেলার মাঠে বিকেলের ২ ঘণ্টা ছিল আমাদের চিত্ত-বিনোদনের এবং একমাত্র সান্ত্বনার স্থান।

আমরা কমিউনিস্ট হয়েছি, ক্লাস করি, গোপনে বই-পত্র পড়ি—এই সমস্ত সংবাদ ইতিমধ্যে আই. বি. এবং জেল-কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে গেছে। আই. বি. তখন জেল-কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিচ্ছে—এঁদের বে-আইনী বই-পত্র খুঁজে বের কর, ক্লাস বন্ধ কর ইত্যাদি। এই সংবাদ পাবার পর স্বাভাবিকভাবে আমরা একটু হুঁশিয়ার হয়ে গেলুম।

মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' বইখানার মাত্র একটি কপিই ছিল আমাদের কাছে। এই মূল্যবান বইটিকে রক্ষা করার প্রয়োজন তাই সকল বন্ধুই অনুভব করেছিলেন। এই কারণেই 'ক্যাপিটাল' ক্লাসের সময় আমরা অন্য দুই-তিনখানা বইও সঙ্গে

রাখতুম। এর মধ্যে এঙ্গেলস-এর 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' এবং 'এ্যান্টি ডুরিং'—এই দুখানা কঠিন ও রসকসহীন বইও রাখা হতো। একদিন সত্যিই দুপুর বেলা জেলের বড় সাহেবের নেতৃত্বে জেল-সিপাহীরা ক্লাসের সেলটাকে ঘেরাও করে ফেললো এবং তল্লাসী করে এই বই দুখানা নিয়ে গেল।

সুপার বললো, 'তোমরা কেন কমিউনিজমের বই পড়?' 'আমরা উত্তর দিলুম, 'অবসর সময়ে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতির বই আমরা পড়ি। এই বই পড়া নিশ্চয়ই দোষের হতে পারে না। এই বই পড়া তুমি বন্ধও করতে পার না।'

সুপার বললো, 'Socialism is good but communism is bad, আমিও তো একজন সোশ্যালিস্ট—দেশে লেবার পার্টিকে সমর্থন করি'···ইত্যাদি।

যাবার সময় সুপার বলে গেল, 'বই দু-খানা আমি পড়ে দেখব, ভালো হলে তোমাদের নিকট ফেরত দেব। খারাপ হলে, কমিউনিজম থাকলে—এই বই তোমরা পাবে না।'

আমরা কয়েকটা দিন খুবই চিন্তায় কাটালুম। তিনদিন পর আমাদের প্রতিনিধির নিকট বই দুখানা ফেরত দিয়ে সুপার বললো, "Bad, bad, very bad. No love, no adventure, no tragedy in it ··তোমরা কি করে এই খারাপ আর বাজে বই পড় —এর মধ্যে ভালোবাসা কিংবা দুঃসাহসিকতা কিছু নেই, বিয়োগান্ত বা মিলনাত্মক কোনো কিছু নেই। আমার তো ঘুম এসে যায়···" ইত্যাদি।

মন-কষাকষি ও রাজনৈতিক শত তিক্ততার মধ্যেও ১৯৩৫ সালে যাত্রা, নাটক, নাচ, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে পূজা উৎসব প্রতিপালন করা হলো। এই সমস্ত কাজের নেতা হলো লোকনাথ বল, ধীরেন চৌধুরী, ফণী দাশগুপ্ত, বঙ্গেশ্বর রায়, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বটুকেশ্বর দত্ত,

নিবারণ চক্রবর্তী, সুধা সেন, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, মোক্ষদা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্ধুরা।

এরপর নিত্য নতুন বারতা নিয়ে এলো ১৯৩৬ সাল। ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগে বহু রাজবন্দী আন্দামানে এলো। মেদিনীপুর বার্জ-হত্যা-মামলা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র-মামলা, হিলি মেল রাবারি-মামলা, লিবং গুলিবর্ষণ-মামলা. রংপুর, বীরভূম, দিনাজপুর, ময়মনসিং ষড়যন্ত্র-মামলার বন্দীরা এসে উপস্থিত হলো আন্দামানের কারাগারে। নতুন বন্ধুদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা দেখা দিল তারা কোন্ কিচেনে খাবে তা নিয়ে।

তখন ভারতের অনুশীলন পার্টির পুরনো কর্মীদের একাংশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে আলাদাভাবে পড়াশুনা করছেন। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারকে সম্পাদক করে তারা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করল। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের মারফত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করতুম। কিছু দিনের ভিতরই অনুশীলনের পুরনো বন্ধুরা একটি নতুন কিচেন করল। জেল-কর্তৃপক্ষও ৪টি কিচেনের পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করল। জেল-কর্তৃপক্ষ একটি কিচেনকে জিনিসপত্র কম দিয়ে অপর কিচেনের বিরুদ্ধে লাগাবার চেষ্টা করত। কিছু দিনের মধ্যে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারল যে, এই ব্যবস্থায় সর্বদিক থেকে রাজবন্দীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

যুগান্তর পার্টির সুনীল চ্যাটার্জি, অনুকূল চ্যাটার্জি, প্রমোদ বসু, নন্দ দাশগুপ্ত, সুধা সেন, ক্ষিতীশ রায়, রাজেন চক্রবর্তী, ভবরঞ্জন পতিতুণ্ড, শশীন চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুরা বহু পূর্বেই কনসলিডেশনে যোগ দেন। কৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী, মোক্ষদা চক্রবর্তী, হরিপদ দে, প্রফুল্ল সান্যাল, প্রভাত মিত্র, সত্য চক্রবর্তী, কেতু বসু প্রভৃতি অনুশীলন পার্টির বহু পুরনো কর্মী, মেদিনীপুরের ভূপাল পাণ্ডা, কামাখ্যা ঘোষ, সরোজ রায়, নন্দদুলাল সিং,

অজিত মিত্র এবং দিনাজপুরের নগেন দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু গুহ প্রভৃতি বহু বন্ধু কনসলিডেশনে যোগ দিলেন। ঢাকার অনিল মুখার্জি, অমূল্য সেন এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, মাস্টার মহাশয় (প্রভাত চক্রবর্তী) প্রভৃতি বন্ধুরাও আমাদের কনসলিডেশনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

১৯৩৫ সালে সতীশদা (পাকড়াশী), নিরঞ্জনদা (সেনগুপ্ত), সুনির্মল সেন এবং ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে খোকাদা (সুধীন্দ্র রায়), রবি নিয়োগী এবং আরো কয়েকজন বন্ধু বাঙলাদেশে ফিরে গেলেন। খোকাদা ও সতীশদা বাঙলাদেশে ফিরে যাবার পূর্বে আমাদের বলে যান যে, তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেই যোগ দেবেন।

পাঞ্জাব থেকে ধন্বন্তরী, হাজরা সিং, বিহার থেকে বিশ্বনাথ মাথুর, রাম সিং, মাদ্রাজ জেল থেকে খুসীরাম মেহটা, শম্ভুনাথ আজাদ প্রভৃতি নতুন বন্ধুরা এলেন আন্দামানের বন্দীশালায় এবং এঁরা কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কনসলিডেশনে যোগ দিলেন।

পূর্বেই বলেছি, স্থান-কাল, সমকালীন অবস্থা এসব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার মতো অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে আত্মসমালোচনা শুরু করলুম—তা যেন আর শেষ হয় না। প্রায় ৩ মাস ধরে চললো এই পর্ব। ধরুন, রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হলো—প্যারী কমিউন কি ছিল—এই নিয়ে। কিংবা, Democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry অথবা Dictatorship of the proletariat—মার্কস ও লেনিন দুই স্থানে এই-যে দুই রকম কথা বলেছেন—এ নিয়েও চলতো আমাদের অন্তহীন তর্ক-বিতর্ক। কোথায়, কখন, কোন বাস্তব অবস্থায়, কি দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্কস ও লেনিন কোন কথা বলেছেন সেসব সম্পর্কে সঠিকভাবে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিবেচনা করতে আমরা তখনও পারতুম না।

সংগঠনের ক্ষেত্রেও নানা প্রশ্ন দেখা দিল। কোনো কোনো বন্ধু স্পষ্টভাবে বললেন, আমরা যখন কমিউনিস্ট হয়েছি তখন সর্বক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিস্টদের মতোই আচরণ করতে হবে। আমরা তখন 'Humanity uprooted', 'Broken Earth' প্রভৃতি বই পড়ছি এবং জেনেছি, রুশ দেশের কমিউনিস্টরা সকলকে খাইয়ে যদি কিছু থাকে তবে খায়। কিংবা সিনেমাতে সকলের স্থান করে যদি সিট থাকে তবেই কমিউনিস্টরা সেখানে ঢোকে। তারা সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার হাতে-কলমে প্রতিষ্ঠিত করেছে—আমরা তা এখানে কেন করব না? এই জেলখানায় তার প্রয়োগ অবশ্যই শুরু করতে হবে। বন্ধুদের মাঝে অনেকেই বিড়ি খায় কিন্তু পয়সা কোথায় পাবে? বন্দীদের নিজস্ব অর্থে বিড়ি কিনবার সুযোগ আন্দামানের জেল-কর্তৃপক্ষ দিয়েছিল; কিন্তু তখন গোটা রাজবন্দীদের মধ্যে মাত্র ১৫/২০ জনের প্রতি মাসে বাড়ী থেকে টাকা আসে। ৪০/৪৫ জন রয়েছে যাদের বছরে মাত্র ৩/৪ বার টাকা আসে। অধিকাংশ বন্ধুদের পরিবারেরই বাড়ী থেকে টাকা পাঠাবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বন্দীদের জন্য প্রয়োজন কিছু বিড়ি এবং জাঙ্গিয়া-কোর্তা পরিষ্কার রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত এক টুকরো করে মেটে সাবান। আমরা ঠিক করলুম, কমিউনিস্ট বন্দীদের যত টাকা আসবে তার শতকরা-২০ ভাগ কেটে নিয়ে সাধারণ ফাণ্ডে জমা দেব এবং তা দিয়ে বিড়ি ও সাবানের ব্যবস্থা করব। তবু ঐ ফাণ্ড থেকে প্রতিদিন বিড়ি-খানেওয়ালা বন্ধুদের প্রত্যেককে ৩/৪টার বেশি বিড়ি দেওয়া যেত না। আমরা ১টা বিড়ি সাধারণত ৩/৪ জনে খেতুম। এই জন্য গ্রুপ করে বিড়ি খাওয়া হতো। এই অবস্থায় কিছু কিছু বন্দীর কাছ থেকে দাবি উঠল—বন্ধুদের যত টাকা আসবে তা সবই সাধারণ ফাণ্ডে জমা দিতে হবে, তা না হলে সে কমিউনিস্ট নয়, বলশেভিক নয়।

এই সময় কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে চট্টগ্রাম-বন্ধুদের উদ্যোগে

জেল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত একটি ভলান্টিয়ার কোর, অর্থাৎ মিলিশিয়া সংগঠিত হয়েছিল। এতে মিলিটারি প্যারেড, কাঠের বন্দুক নিয়ে কুচকাওয়াজ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। একজন বাইরের মিলিটারি অফিসার এসেও কয়েকদিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিল। একদল কমিউনিস্ট বন্ধুর মত হলো: এই সমস্ত কাজে কমিউনিস্টদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের ধারণা হলো, যুবক-বন্ধুরা যাতে পড়াশুনা না করে, তাদের মনকে যাতে বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত করা যায় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপর বন্ধুদের কথা হলো, এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্যতা থাকলেও পড়াশুনা তো বিপ্লবের জন্যই, সেই বিপ্লবের জন্যই তো মিলিটারি ট্রেনিং অত্যাবশ্যক। জীবনে এ সুযোগ আমরা কোথায় পাব? যতটুকু পারি এখানে এই সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের মিলিটারি শিক্ষা নিতে হবে। কমিউনিস্টরা বিপ্লব ছেড়ে দিয়েছে, তারা আর সশস্ত্র লড়াই করবে না, মিলিশিয়ায় যোগ দিলে এই সমস্ত মিথ্যা প্রচারও ধূলিসাৎ হবে। এইসব মতপার্থক্য সত্ত্বেও কমিউনিস্ট-দের একটা অংশ কিন্তু প্রথম দিন থেকে প্যারেডে যোগ দিয়েছিল।

যাহোক, ১৯৩৬ সালে পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং চীন দেশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নয়া-গণতন্ত্রের সংগ্রাম। আমরা এই সমস্ত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের যতটুকু সংবাদ সুদূর আন্দামানে বসে সংগ্রহ করতে পারতুম তা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক ও আনন্দ অনুভব করতুম। আমরা জানতুম, স্পেনের গণতান্ত্রিক শক্তির জয় মানে দুনিয়াব্যাপী গণ-তান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী মানুষের জয়। তাই যেদিন শুনলুম, স্পেনে গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা শাকলাৎওয়ালার নামে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠিত হয়েছে, সেদিন আমাদের আনন্দ আর ধরে না। র‍্যালফ

ফক্স, কডওয়েল, হেমিংওয়ে ও অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিপ্লবীরা ফ্যাসিস্ট দস্যুদের হাত থেকে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য জীবন আহুতি দিতে সমর ক্ষেত্রে রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছেন, একথা জানার পর সেদিন সুদূর আন্দামানে বসেও সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করলুম দুনিয়াব্যাপী সভ্যতার লড়াইতে আমরাও এঁদের সঙ্গে রয়েছি। ভারতীয় জনতার পক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহানুভূতি ও সমর্থন জানাবার জন্য যুদ্ধফ্রণ্টে গিয়েছিলেন এবং স্পেনের সংগ্রামী জনতাকে সাহায্য করার জন্য অর্থের আবেদন করেছিলেন। আমরাও এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সৌভ্রাতৃত্ব-মূলক সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন উপবাস করেছিলুম এবং সামান্য কিছু টাকা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। আজকে বিরাট পরিবর্তিত সোশ্যালিস্ট সমাজব্যবস্থা ও প্রগতিশীল মানবসমাজ অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যেমন আমরা ভিয়েতনামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর পরাজয়ে উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হই এবং মুক্তি-ফৌজের সামরিক পরাজয়ে মর্মাহত ও নিরুৎসাহিত হই, সেইদিনেও সেইরূপ হতুম। বার্সিলোনার পতনের সংবাদে আমাদের অনেক সেলেই সেদিন আলো জ্বলে নি। আমরা রাত্রে উপবাস করে কাটিয়েছি এবং পরের দিন কমরেড স্তালিনকে টেলিগ্রাফ করেছি : "অনুগ্রহ করে স্পেনে হস্তক্ষেপ করুন।"

যাহোক, কিচেন ভাগ করে কমিউনিস্ট না হবার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সভ্য সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এই কিচেন ভাগের পূর্ণ সুযোগ নিতে থাকে জেল-কর্তৃপক্ষ আর বন্দীদের মাঝেও কাজের চাপ এবং হয়রানি নতুন করে বাড়তে থাকে। বন্দীদের নিকট সে-এক অসহ্য দমবন্ধ অবস্থা। কমরেড হালিম আলীপুর জেলে এই কথা শুনে খুবই

দুঃখ পান। তিনি আলীপুর জেল থেকে আন্দামান-বন্ধুদের নিকট গোপনে চিঠি পাঠিয়ে বলেন :

"...আপনারা শুধু এইটুকু বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনাদের ঝগড়াঝাটি, দলাদলির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে জেল-কর্তৃপক্ষ। আপনারা কার দোষ বেশি বিচার না করে অবিলম্বে একত্রিত হয়ে যান ···। দেশ আপনাদের নিকট অনেক বেশি আশা করে।" এই ক্ষুদ্র ও গোপন চিঠিখানা ম্যাজিকের মতো কাজ করল। চিঠিখানা পাবার পর আড়াইশত রাজবন্দী এক রাত্রের মধ্যেই গোপনে আলোচনা করে সবগুলো কিচেনের খাবার ব্যবস্থা একত্রিত করে ফেললো। পরের দিন জেল-কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা দেখে হতভম্ব ও একদম বোকা বনে গেল। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এলো আনন্দের নতুন জোয়ার। এই চিঠিখানা যে-বন্ধুটি আন্দামানে নিয়ে গিয়েছিলেন (দীনেশ দাস—দিনাজপুর) বন্দীদের মাঝে তাঁর নাম হয়ে গেল শান্তির দূত—উইলসন।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি সর্দার গুরুমুখ সিং আন্দামানে পুনরায় ফিরে আসেন। এই সর্বপ্রথম আমরা একজন পুরনো কমিউনিস্টকে আমাদের মাঝে পেলুম। সর্দারজী পূর্বে আমাদেরই মতো একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়ে সকলের যে কী আনন্দ হলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর আগমনে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো।

আমাদের নিজেদের ভিতর সে-সময় যেসব মতদ্বৈধতা বিরাজ করছিল আমরা তাঁর নিকট তা সবই উপস্থিত করলুম। তখন মতদ্বৈধতার জন্য কনসলিডেশন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে রয়েছে। আমরা কনসলিডেশন থেকে তাঁকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করলুম।

প্রথমেই কনসলিডেশনের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে অভিনন্দন

জানালুম। তিনি উত্তরে বললেন: "তোমরা এতগুলো বিপ্লববাদী লোক কমিউনিস্ট হয়েছ, এটা খুবই আনন্দের কথা।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই তিনি আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

আমাদের সাংগঠনিক সমস্যা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন: "কেন তোমরা প্যারেড করবে না? বিপ্লবের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা শিখতে হবে—এই তো লেনিনের শিক্ষা। তবে যাঁরা বয়স্ক ও অসুস্থ তাঁদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে এই প্যারেড চাপিয়ে দিও না।" পূর্বে যাঁদের কিছু আপত্তি ছিল এরপর থেকে তাঁরাও প্যারেডে নেমে গেলেন।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি বললেন: "ভারতবর্ষ সোশ্যালিস্ট দেশ তো দূরের কথা—এমন কি স্বাধীন পর্যন্ত নয়। তোমরাও সবে মাত্র কমিউনিস্ট হতে চলেছ। বাইরে যারা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রয়েছে তারাও বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত অর্জিত টাকা পার্টিকে দেয় না। আয়ের একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে পার্টিকে দিতে হয়। এখানেও তাই তারা দেবে। যদি কেউ সবটা দিতে চায় তাতেও বাধা দেওয়া হবে না।" এরপর থেকেই শতকরা ৩০ ভাগ টাকা সাধারণ ফাণ্ডে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো।

আমরা ঠিক করলুম, সর্দারজী সমস্ত রাজবন্দীর কাছে ৪ দিন বক্তৃতা করবেন। প্রথম দুই দিন তিনি বলবেন এবং পরের দুই দিন তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা হলো ২টি: (ক) তিনি কেন কমিউনিস্ট হলেন? আর, (খ) ভারতের কমিউনিস্টরা কি করতে চায়?

এই বিষয়বস্তুর উপর আন্দামানের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা নীরবে তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছে। প্রশ্ন করার সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং বুদ্ধিজীবীসুলভ অনেক কেরামতি দেখিয়ে তাঁকে বহু প্রশ্নও করা হয়েছে। তিনি সহজ সরল ভাষায়

মজুরশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সেই সব প্রশ্নগুলো আজ আর আমার সঠিক মনে নেই, তবে যা মনে আছে তার দু-একটি এখানে উল্লেখ করছি:

১) প্রশ্ন: ভারত স্বাধীন হবার পর কি ধরনের রাষ্ট্র হওয়া উচিত?

উত্তর: মজুর-কৃষক রাষ্ট্র হবে, কারণ তারাই হলো সমাজের শতকরা ৯৫ ভাগ।

২) প্রশ্ন: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, না শ্রমিক-কৃষক একনায়কত্ব, না সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র?

উত্তর: আমি পূর্বেই বলেছি শ্রমিক-কৃষক রাজ হবে।

৩) প্রশ্ন: আপনি কি রুশ ভাষা শিখেছেন?

উত্তর: আমি রুশ ভাষা শিখতে যাই নি, গিয়েছিলুম বিপ্লবের বা ক্রান্তির শিক্ষা গ্রহণ করতে। আমার যোগ্যতা অনুযায়ী তা শিখে এসেছি।

৪) প্রশ্ন: আপনি আপনার বক্তৃতায় বার বার রুশ দেশের কথা, কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলেছেন, কিন্তু রুশ দেশ বা কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের ভারতের স্বাধীনতার জন্য কি করেছে?

এই প্রশ্নে সর্দারজী খুবই মর্মাহত হন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি এই প্রশ্নটির উত্তর দেন। তাঁর সেই উত্তরটি ছিল এই রকম:

"আপনারা জানেন না বন্ধু, আসমান ও জমিন—দুনিয়ার যেখানেই খোঁজ করুন না কেন সোভিয়েত রাশিয়ার মতো ভারতের এত বড় বন্ধু আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি এই দেশগুলো আমি দেখেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের সত্যিকার বড় সাথী আমি কোথাও দেখি নি। নির্বাসিত অধিকাংশ ভারতীয় বিপ্লবীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, হাত-খরচ, চলাফেরা করার খরচ, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছে। আর,

শিক্ষার জন্য বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও পাবেন কি? আমার জীবনের একটা উদাহরণ দিয়েই বলছি—আমি গতবার ভারতে আসার সময় কাবুলে গ্রেপ্তার হই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দাবি করে যে, এই বন্দী ভারতের জেল থেকে পলায়ন করেছে সুতরাং এই বন্দীকে ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট সমর্পণ করতে হবে। আমরা কাবুল জেলে অনশন করি এবং মুক্তি দাবি করে বলি, "আমরা সোভিয়েত নাগরিক।" সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক আইনে আছে—যেকোনো দেশের বিপ্লবী বা বৈজ্ঞানিক পালিয়ে এসে সোভিয়েত রাশিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। আমাদের ঐ কথা মেনে নিয়েই সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট দাবি করল, আমি ও সর্দার পৃথ্বী সিং সোভিয়েত নাগরিক। কাবুলে আমাদের মুক্তির জন্য বিরাট আন্দোলন হলো। আফগান গভর্নমেণ্ট আমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। আমরা আবার চলে গেলুম সোভিয়েত ইউনিয়নে। পুনরায় ফিরে এলুম দেশে কাজ করতে। ভারতে এসে গ্রেপ্তার হলুম—পাঠিয়ে দিল এই আন্দামানে পুরনো সাজা খাটাবার জন্য। প্রতিটি পরাধীন দেশের কিছু না কিছু বিপ্লবী কর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নে রয়েছে। সর্বদা মনে রাখবেন—শুধু ভারতের নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত দুনিয়ার মজুর-কৃষক এবং স্বাধীনতাকামী মেহনতী মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু—স্বাধীনতাকামী প্রতিটি জাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

সর্দারজী আসার পর আমাদের মধ্যে আরো দুটি জিনিসের পরিবর্তন হলো। জেলের দড়ি পাকানোর কাজ নিয়ে আর গোলমাল হয় নি। সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত আমরা রীতিমত কাজ করতুম। সর্দারজী বলতেন: "মজুরশ্রেণীর কর্মীদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের কাজে অভ্যাস রাখতে হবে।"

দ্বিতীয়ত, আমরা ভাতের দলা করে তার মাঝে নুন রাখতুম,

তাতে বেশ কিছু ভাতের অপচয় হতো। চাল সঞ্চয় করতে পারলে তার বিনিময়ে তেল, পিঁয়াজ, মশলা প্রভৃতি আমরা সংগ্রহ করতে পারতুম। তিনি বলতেন: "একটি ভাতও কেউ ফেলবে না, যত পার খাবে, কৃষক-মজুরের ছেলেরা ভাত নষ্ট করার কথা কল্পনাও করতে পারে না।" এরপর থেকে এক টুকরা কাগজে নুন দেওয়ার ব্যবস্থা হলো এবং প্রচুর চাল সঞ্চয় করে তা দিয়ে তেল-মশলা ক্রয় করে আমাদের খাবারের মান উন্নত করা হলো।

সর্দারজী ব্যক্তিগত কথাবার্তায় সেদিন দুটো কথা আমাদের বলেছিলেন:

(১) তোমাদের সঙ্গে যারা এসেছে, তারা সকলে মুক্তির পর যে কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করবে তা আশা করো না।

(২) স্পেনে গণতন্ত্রের পরাজয় ঘটলে ফ্যাসিস্টরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করবে। এটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদেরও অভিমত।

ইতিমধ্যে অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে যায়। মধ্যবিত্তের সোশ্যালিস্ট পার্টির পরিকল্পনা ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্য নিয়েই মূলত আলোচনা চলে। সর্দারজী আসার পর এই আলোচনা আরো দানা বেঁধে ওঠে। পূর্বেই ঐ দলের অনেক বন্ধু কনসলিডেশনে যোগ দিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অনিল মুখার্জী, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, অমূল্য সেন, প্রমথ ঘোষ, নরেন ঘোষ প্রভৃতি বহু বন্ধুই কনসলিডেশনে যোগ দিলেন। তখন বাইরে ছিল শুধু চট্টগ্রাম-গ্রুপের কিছু বন্ধু, অনুশীলনের কয়েকজন এবং অন্য দু-চার জন বন্ধু। কনসলিডেশনের সভ্য-সংখ্যা তখন প্রায় দুই শত।

১৯৩৬ সালের মে-দিবস আমরা উৎসব হিসাবে সেলুলার জেলে পালন করলুম। লাল পতাকা অভিবাদন, প্যারেড, গান-বাজনা, সভা, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সবই আমাদের সাধ্যানুযায়ী করা

হলো। তিক্ততা কেটে গিয়ে সেলুলার জেলে তখন নতুন জীবন ফিরে আসছে।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কংগ্রেস আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হলেও কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মজুর-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পূর্বেই ছিল, নতুন করে জন্ম হলো সর্বভারতীয় কৃষক সভার। এই উভয় সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে। চরম নিষ্পেষণের আবহাওয়া কিছুটা প্রশমিত হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার সামান্য আভাস দেখা দিতে শুরু করেছে।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে নতুন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের ঘোষণা করেছে। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাস হয়েছে। এই শাসন-সংস্কার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) ফেডারেল সরকার ঃ সংক্ষেপে বলা যায়, এই সরকারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি, ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি এবং সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা থাকবেন। এক কথায়, দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ খয়েরখাঁ ও সামন্তবাদী রাজন্যবর্গদের প্রতিনিধি। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্থা ঘোষণা করল যে, তারা এই ফেডারেল ব্যবস্থার সঙ্গে সামন্যতম সহযোগিতা করবে না এবং নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করবে না। কংগ্রেস প্রথম থেকে বয়কট করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ঐ ব্যবস্থা কার্যকর করতে কোনোদিন সাহস করে নি।

(খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঃ বাঙলা, পাঞ্জাব, বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশগুলি বাদেও নতুন করে ভাষার ভিত্তিতে ৩টি প্রদেশ গঠন করা হয়েছে—(১) সিন্ধু (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং (৩) ওড়িশা। প্রাদেশিক পরিষদেও

ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ। যারা ম্যাট্রিক পাস করেছে এবং কমপক্ষে এক টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়—শুধু তারাই ভোটাধিকার পেল। 'বিভক্ত রাখো ও শাসন করো'—সাম্রাজ্যবাদী এই ষড়যন্ত্রের নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে। ১৯০৯ সাল থেকেই সাধারণ ও মুসলমান, অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা দেশে চালু করা হয়। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারে, সাধারণ ও মুসলমান এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তো রয়েছেই—তার উপর ভারতীয় খ্রীষ্টান ও ইয়োরোপিয়ান, শিখ আর হিন্দুর মধ্যে বর্ণহিন্দু ও তফসিলী এইরূপ ভাবে ভাগ করা হয়েছে। গোটা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি যে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি, পশ্চাৎ-পদতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে তা সংস্কার না করে তার পূর্ণ সুযোগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের অর্থ হলো—ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সরল, অজ্ঞ জনতাকে ধর্মের ভিত্তিতে আরো পশ্চাৎপদতায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া। চরম সুবিধা-বাদী সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি আইনসভায় কয়েকটি সিট পাবার আশায়, লাগামহীন চরম সাম্প্রদায়িক প্রচারের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে জনতাকে ঠেলে দেয়। ধর্মের নামে নির্বাচনে শুধু যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আবহাওয়াই সৃষ্টি হয় তাই নয়, এমন কি বর্ণহিন্দু ও তফসিলীর মধ্যেও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। গত ৩০ বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে কৃত্রিম ও প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে যে বেদনাদায়ক ও কলঙ্ক-জনক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তার মূল খুঁজতে হলে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন এবং ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুদূর-প্রসারী ষড়যন্ত্রের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, সংখ্যালঘুর অধিকার, শিল্প প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গভর্নরের হাতে রেখে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে অর্থ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কারাবিভাগ, পূর্ত, কৃষি প্রভৃতি

অ-গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

কংগ্রেস ঘোষণা করল যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-সংস্কারকে জনতার স্বার্থে আরো সংশোধন করার জন্যই কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করবে এই সংবাদে জনতার মনে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হলো। আমরাও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলুম, এই সুযোগে দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। নবাগত বন্ধুরা নতুন পরিবেশে পড়াশুনা-খেলাধূলা ও মেলামেশার এই সুযোগ নিয়ে মেতে আছে। এদিকে পুরনো বন্ধুদের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে—শীতবিহীন ও নোনা আব-হাওয়ায় অনেকের স্বাস্থ্যই টিকছে না। ফণী নন্দীর মতো জোয়ান বন্ধুটি হঠাৎ টি. বি.-তে আক্রান্ত হলো। লোকাদা, অনুকূল চ্যাটার্জী, বিমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা বলতে শুরু করল যে, তাঁদেরও মাথা ঘুরছে—শরীর ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে।

প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস (১) বোম্বে (২) মাদ্রাজ (৩) যুক্ত প্রদেশ (৪) মধ্যপ্রদেশ (৫) বিহার (৬) ওড়িশা (৭) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বেরিয়ে এলো। বাঙলা, আসাম ও সিন্ধুতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করল। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট-জমিন্দার পার্টি (জমিদার, জায়গিরদার ও ব্রিটিশ খয়েরখাঁদের পার্টি) সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হিসাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল।

মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে গভর্নর হস্তক্ষেপ করবে না—এই প্রতিশ্রুতি পেলেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নিল। গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপ করে এই প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল।

সিন্ধু ও আসামে কংগ্রেস সমর্থিত মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। বাঙলা দেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস পার্টি এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজী হলো না।

কংগ্রেসের ধারণা ছিল—কৃষক-প্রজা পার্টির অনেক সভ্য কংগ্রেসে যোগ দেবে। কিন্তু কৃষক-প্রজা পার্টির কিছু সভ্য মুসলিম লীগের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। ফজলুল হক সাহেব ইয়োরোপিয়ানদের সমর্থনে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে বাঙলাদেশে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বাঙালাদেশের রাজনীতি এখান থেকেই তীব্র সাম্প্রদায়িক মোড নিতে শুরু করে।

আবার আমরণ অনশন

আন্দামান-রাজবন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বাঙলাদেশের মানুষ, তারপরের স্থান ছিল পাঞ্জাবের। এই উভয় স্থানে মন্ত্রিত্ব পেয়েছে—সুবিধাবাদী ব্রিটিশ খয়েরখাঁ গোষ্ঠী। সুতরাং সংগ্রাম ব্যতীত মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি দেশেও ফিরে যেতে পারব না, একথা আমরা পরিষ্কার বুঝে ফেললুম। বেশ কিছু আলোচনার পর আমরা সকলে মিলে ভারত গর্ভনমেণ্টের নিকট স্মারকলিপি পাঠালুম: দেশে নতুন শাসনসংস্কার এসেছে সুতরাং সকল প্রকার রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক এবং কালবিলম্ব না করে আন্দামান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করা হোক। বন্দীদের ওজন, স্বাস্থ্যের রিপোর্ট, মেডিকেল চার্ট প্রভৃতি উপস্থিত করে দেখানো হলো—আন্দামানে বন্দীদের স্বাস্থ্য টিকছে না। আমরা প্রতিটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নিকটও স্মারকলিপি পাঠালুম।

কয়েকদিন পরই কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই জন সদস্য রায়জাদা হংসরাজ (কংগ্রেস, পাঞ্জাব) ও ইয়ামিন খাঁ (মুসলিম লীগ, দিল্লী) আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমরা বিস্তারিতভাবে নানা তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম যে, আন্দামানে আমাদের স্বাস্থ্য টিকছে না। আমরা একটি লিখিত মেমোরেণ্ডামও তাঁদের হাতে দিলুম। আমাদের দাবি হলো : অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে

বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাঁরা যাবার পূর্বে বললেন, "...আমরা ভারত গভর্নমেন্টকে বলব, যতটা চাপ আইনসভায় সৃষ্টি করা যায় করব, তবে শেষপর্যন্ত কি হবে বলতে পারি না।" রায়জাদা হংসরাজ পাঞ্জাব-বন্ধুদের, বিশেষ করে ধন্বন্তরী ও বিজয় সিং-এর পরিচিত ছিলেন। কারণ, এদের মামলায় তিনি আসামীদের পক্ষে এডভোকেট ছিলেন। আমাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী রায়জাদা হংসরাজকে গোপনে বলে দেওয়া হলো: "যদি আগামী দুই মাসের ভিতর আমাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে না পারেন, তবে মনে রাখবেন আমাদের মৃতদেহগুলো বঙ্গোপসাগরে ভাসবে।"

সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এখন কমিউনিস্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রধানত তাঁদের সিদ্ধান্তের উপরই অনশন নির্ভর করে। দুই শতের উপর রাজবন্দীর সবচেয়ে কষ্টদায়ক জীবন-মরণ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ কাজ নয়। পূর্বেই বলেছি, বন্ধুদের মাঝে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—দেশে গেলেও তারা মুক্তি পাবে, এ সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, তখনো বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা মুক্তি পায় নি।

সে-সময়ে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে যাচ্ছে সুতরাং তার পূর্বেই আমাদের দেশের মাটিতে পা রাখতে হবে। তাই আমাদের সর্বনিম্ন দাবি কি হবে, এটাই ছিল তর্কের মূল বিষয়। এটা পূর্ণ না হলে আমরা কিছুতেই অনশন ভঙ্গ করব না। কিন্তু কেউ কেঁউ বল্লেন, সর্বনিম্ন দাবি—মুক্তি। কেউ কেউ বল্লেন, দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দুই মাস ধরে বহু আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হলো—আমরা মূলত তিনটি দাবি পেশ করব: (১) সকল রকমের রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি (২) দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া (**Repatriation**) ও (৩) মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক বন্দীদের কমপক্ষে ডিভিশন "টু" করা। শেষোক্ত দাবি দুটো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই অনশন ভঙ্গ করব না;

এবং এটাই আমাদের সর্বনিম্ন দাবিরূপে পেশ করা হলো।

দেশে নতুন শাসন-সংস্কার এসেছে এই অবস্থা বিবেচনা করে আমরা ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবিগুলো মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করলুম :

(১) অবিলম্বে সকল রাজবন্দী (বিনাবিচারে বন্দী), রাজনৈতিক বন্দী (সাজাপ্রাপ্ত বন্দী), অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। নির্বাসিত বন্দীদের দেশে ফিরে আসতে দিতে হবে। সমস্ত রকম গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, মামলা সব তুলে নিতে হবে। দেশে পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

(২) আন্দামান-রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৩) সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে তাঁদের সকলকে ডিভিশন 'টু'-র মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

শেষোক্ত দাবি দুটো হলো সর্বনিম্ন দাবি এবং এটা পূর্ণ হবার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেই অনশন ভঙ্গ করা হবে। আমরা ঠিক করলুম যে, সাংগঠনিক ও যোগাযোগের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বোঝা যায় সর্বনিম্ন দাবি পূর্ণ হয়েছে। কনসলিডেশন থেকে অন্যান্য দল ও রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে কথা বলে অনশন শুরু করার ভার দেওয়া হলো দুইজন বন্ধুর উপর। এবারকার সংগ্রাম স্থানীয় বা আংশিক দাবি নিয়ে নয়—মূলত সংগ্রাম হচ্ছে রাজনৈতিক দাবি নিয়ে। এই সংগ্রাম হবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রথম দিন থেকেই যাতে আমরা জনসাধারণের সমর্থন পেতে পারি সেই ব্যবস্থা ও প্রস্তুতির জন্য আরো দুই মাস সময় নেওয়া হলো।

প্রথমত, আমরা অন্যান্য দল ও ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলি। সকলেই আমাদের সঙ্গে একমত হন। আমরা প্রতিটি দল থেকে

প্রতিনিধি নিয়ে একটি সর্বোচ্চ সংগ্রাম কমিটি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অনুশীলন পার্টি থেকে প্রভাত চক্রবর্তীকে (মাস্টার মহাশয়) প্রতিনিধি দেওয়া হয়। তিনি তখন বলেছিলেন: "আমাদের পার্টির তো প্রায় সবাই আপনাদের সঙ্গে মিশে গেছে।" তিনি পরে মুক্তি পেয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কনসলিডেশনের বাইরে তখনও সবচেয়ে সংগঠিত দল ছিল চট্টগ্রাম-গ্রুপ। তাঁদের সাথে সম্পর্ক তখন আমাদের আরো অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। গণেশদা ও অনন্তদা তখনই আমাদের প্রথম বললেন: "আমাদের কোনো প্রতিনিধির দরকার নেই। কনসলিডেশনের প্রতিনিধিই আমাদের প্রতিনিধি।" তাঁরাও মুক্তি পেলে বাইরে যেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করবেন—এই ইঙ্গিত তখনই আমাদের দিয়েছিলেন। এই সংবাদ শুনে আমাদের মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেল।

আমরা ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে আগের থেকেই সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করি। সর্দারজী বিদেশের যে সমস্ত ঠিকানা জানতেন—ক্যালিফোর্নিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেন—সর্বত্রই আমরা গোপনে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

• ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের কংগ্রেস নেতা, প্রগতিশীল বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, পত্র-পত্রিকার অফিস—সর্বত্রই আমরা গোপনে চিঠি পাঠালুম। আমাদের অনুরোধ একটি: "আমরণ অনশন আগত—আমাদের দাবিকে আপনারা সমর্থন করুন।"

অনশনের ১৫ দিন পূর্বে আমরা ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক সরকার গুলোকে চরমপত্র পাঠালুম: অবিলম্বে আমাদের দাবি পূর্ণ না হলে আমরা অনশন করতে বাধ্য হব। এই অনশনে যদি কোনো রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যু হয় তবে সেজন্য গভর্নমেণ্টই দায়ী থাকবে।

এই দুই মাসে যেসমস্ত বন্ধুরা ভারতে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই আমরা আমাদের দাবি-সম্বলিত একটি কাগজ এবং অনশনের সম্ভাব্য তারিখ বলে দিয়েছিলুম। আমরা অনশনের তারিখটা ঠিক করলুম সেই দিনটিতে, যে-দিনটিতে আমাদের কয়েক-জন বন্ধু (জগৎ বসু, সুধাংশু মজুমদার (মনু), কেশব চ্যাটার্জি (দাদু), কৌমুদী ভট্টাচার্য প্রভৃতি) জাহাজে উঠবে। তাঁদের আমরা বলে দিলুম যে, তাঁরা জেলে থাকুন বা মুক্তি পান—যেন সর্বত্রই আমাদের অনশনের সংবাদ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন। অনশন-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ সংগ্রাম-কমিটি ধন্বন্তরী, প্রভাত চক্রবর্তী ও নলিনী দাসকে নিয়ে গঠিত হলো। অনশন শুরু করার পূর্বে ডাঃ নারায়ণদা আমাদের সকলকে পরীক্ষা করলেন। দীনেশ বণিক ও সুধেন্দু দামকে (মামু) পরীক্ষা করে বললেন, এরাই প্রথম বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবে। পূর্ব থেকে জোলাপ নিয়ে পেট পরিষ্কার করে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রামে আমরা নামবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এক কথায়, তিলে তিলে মৃত্যু-সংগ্রামে এগিয়ে চললুম।

অনশনের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে আমরা চীফ কমিশনারকে চরমপত্র দিলুম। চীফ কমিশনার পরের দিন সকালে এসে আমাদের ভয় দেখালেন: "জানো, তোমরা জেল-বিদ্রোহ শুরু করেছ, চরম সাজা তোমরা পাবে। বেত্রাঘাত, কারাদণ্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি, হাতকড়া, ২৪ ঘণ্টা সেলে লক-আপ—জেল-কোডের সমস্ত কঠোর সাজা তোমাদের উপর প্রয়োগ করা হবে…।"

আমরা বললুম: "তুমি তো জানই আমাদের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। এই অনশন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নয়—ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। তোমার কর্তব্য হচ্ছে ভারত ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারকে অবিলম্বে অনশনের খবর জানানো। মৃত্যুসহ সকল রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই আমরা অনশন শুরু করেছি।"

আমাদের সকলকে সেলে ঢুকাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। আমরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ, রাজনৈতিক বন্দীদের দাবি মানতে হবে প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে আমরণ অনশন শুরু করলুম।

পূর্ব থেকেই বন্ধুদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো—এই সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং খুব কষ্টদায়ক। ১৯৩৭ সালের ২৫ জুলাই আমরণ অনশন শুরু হলো। প্রথম দিন থেকেই প্রায় দুই শত রাজনৈতিক বন্দী অনশনে যোগ দিল। প্রাদেশিক নির্বাচন হয়ে যাওয়ায় ভারতে কিছুটা ব্যক্তিস্বাধীনতা তখন ফিরে এসেছে। অনশনের তিন-চার দিনের মধ্যেই পত্র-পত্রিকায় আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের আমরণ অনশনের সংবাদ প্রকাশিত হলো। ছাত্র-সমাজ ও মুক্ত রাজবন্দীরা ইস্তাহার, পোস্টার, বিবৃতি এবং ছোটখাটো জনসভা মারফত আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের দাবি সমর্থন করতে শুরু করল। সাত দিনের ভিতরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দামান-বন্দীদের সমর্থনে রাস্তায় মিছিল বের করল।

ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় জেলে ও ক্যাম্পে—দেউলী, বকসা, হিজলী, বহরমপুর, আলীপুর, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, রাজসাহী, মেদিনীপুর এবং বিভিন্ন জেলা-জেলে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা আন্দামান-বন্দীদের সমর্থনে অনশন শুরু করল। গোটা ভারত-উপমহাদেশে প্রায় ৩ হাজার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী অনশনে যোগ দিয়েছিল। ১৫ দিনের ভিতরই প্রতিটি শহর ও গ্রামে, আন্দামান বন্দীদের সমর্থনে দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল।

এবার আর কোনো কাঁচা ব্যবস্থা নয়। প্রথম দিন থেকেই জেল-কর্তৃপক্ষ পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছিল। C.M.O, অর্থাৎ চীফ মেডিকেল-অফিসার ক্যাপটেন বিজেতা চৌধুরী ছিলেন একজন বাঙ্গালী অফিসার। তিনি সকল ডাক্তার, অফিসার ও স্টাফ্‌দের বলেছেন,

এবার একজন বন্দীকেও মরতে দেওয়া হবে না। কলকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন থেকে জরুরী তার করে প্রায় ২০ জন ডাক্তার ও কমপাউণ্ডার আনানো হয়েছে। দুধ ও ঔষধপত্র প্রচুর আনিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত জেলের ওয়ার্ড ও করিডোরগুলোকে ভাগ করে বিভিন্ন ডাক্তারের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। খাবার জল, গরম জল, স্নানের ব্যবস্থা, পায়খানা সব কিছুরই ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘুমটিতে (যেখানে এসে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো মিশেছে)—এমারজেন্সি হাসপাতাল, অর্থাৎ জরুরী হাসপাতাল করা হয়েছে। এই হাসপাতাল ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে এবং কোনো-না-কোনো ডাক্তার ওখানে সর্বদাই ডিউটিতে বহাল থাকবে।

যাহোক, এরপর দেখা গেল প্রত্যেক বন্দীকে সকালে ও বিকালে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ যেন এক যুদ্ধফ্রণ্ট। অনশন-বন্দীদের বাঁচাবার লড়াই চলছে। সমস্ত সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও না খেয়ে থাকা, অর্থাৎ অনশন সবচেয়ে যন্ত্রণাময় ও কষ্টদায়ক সংগ্রাম। নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে—চার-পাঁচ জন জোয়ান কয়েদীর দ্বারা বন্দীকে জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা চলছেই। বন্দীরা ক্রমেই দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছে। তারা দিনের পর দিন মৃত্যুর মুখেই এগিয়ে চলেছে।

একের পর একটা দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। অনশনব্রতীদের অবস্থা ক্রমেই কাহিল হচ্ছে। ১২ দিনের দিন টেলিগ্রাফ এলো বিহার, ইউ. পি. ও মাদ্রাজের কংগ্রেস-মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট থেকে, সেই সব প্রদেশের বন্দীদের কাছে। তাতে বলা হয়েছিল :

"তোমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা গভর্নমেণ্টের নিকট দাবি করেছি—অনুগ্রহ করে তোমরা অনশন ভঙ্গ করো।" আমরা বুঝলুম, যেসব প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন সেসব প্রদেশের বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আসল প্রশ্ন হলো—বাঙলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ নিয়ে। ঐ সমস্ত প্রদেশের বন্দীরা তাই উত্তর দিল : "অনুগ্রহ করে আমাদের সমস্ত

াবি পূর্ণ করুন। আমরা অনশন ভঙ্গ করতে পারছি না বলে দুঃখিত।”

১৩ দিনের দিন টেলিগ্রাফ, আসে বাঙলাপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের নিকট থেকে। তিনি লিখেছেন: ‘অনুগ্রহ করে তোমরা অনশন ভঙ্গ করো। তোমাদের দাবি সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করছি।” আমরা বুঝলুম, কোনো দাবিই পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত হয় নি। হক সাহেবের টেলিগ্রাফ হলো আবেগ ও আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।

আমরা উত্তর দিলুম: “অনুগ্রহ করে আমাদের দাবি মেনে নিন। আমরা দাবি পূর্ণ না হবার আগে অনশন ভঙ্গ করতে পারছি না।” এই সমস্ত টেলিগ্রাফ এবং ছোটখাটো যেসব সংবাদ আমরা পেতে শুরু করলুম তাতেই বুঝলুম ভারতে অনশনের সমর্থনে আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। বাইরের আন্দোলনের সামান্য সংবাদও দুর্বল অনশন-বন্দীদের শক্তি বহু গুণ বাড়িয়ে দিত।

২০ দিনের দিন দীনেশ বণিক ও ২১ দিনের দিন সুখেন্দু দাম (মামু) সত্যিই চরম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোলাপসের মতো অবস্থা। ডাক্তররা প্রথমে তাঁদের জরুরী হাসপাতালে নিয়ে গেল। তাঁদের নাড়ি ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো। সি. এম. ও-কেও ফোন করা হলো। তিনি এসে ঔষধ দিয়ে অবিলম্বে জেলের বাইরে এঁদের ‘রস’-এ নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। আবার বন্দীরা মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চারিদিকে অনশন-বন্দীদের মধ্যে সৃষ্টি হলো গভীর আলোড়ন। রস হলো আন্দামান-নিকোবরের সেরা দ্বীপ, এখানেই বড় বড় অফিসারেরা বাস করে এবং প্রধান হাসপাতালও রয়েছে। সি. এম. ও-র চোখের সম্মুখে তারই তত্ত্বাবধানে এঁদের চিকিৎসা চলতে লাগল।

এই অনশনকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের প্রতিটি শহর-বন্দর ও গ্রামে, প্রতিটি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে একই আওয়াজ উঠলো : "আন্দামান ভাইদের ফিরিয়ে আনো, স্বাধীনতা-সংগ্রামী বন্দীদের মুক্তি চাই।" ভারতবর্ষের বহু জায়গায় এবং বাঙলাদেশে একের পর এক বিরাট বিরাট মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ২২ দিনের দিন বঙ্গীয় আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ) জরুরী প্রশ্ন তুলে বললেন : "আমরা অবিলম্বে জানতে চাই অনশন-ব্রতীদের অবস্থা কি রূপ ? আমরা শুনেছি ইতিমধ্যেই ২ জন বন্দীর মৃত্যু হয়েছে, আরো কয়েকজন অনশনব্রতী মৃত্যুপথযাত্রী। গভর্নমেণ্টকে এখনি এই মুহূর্তে, এই হাউসে বলতে হবে দীনেশ বণিক ও সুখেন্দু দাম কখন ও কিভাবে মারা গেল ? গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে অবিলম্বে উত্তর চাই। হাজার হাজার মানুষ গভীর বেদনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।"

শরৎবাবুর এই প্রশ্নে গভর্নমেণ্ট পক্ষ সত্যিই খুব অসুবিধায় পড়ল। কারণ, গভর্নমেণ্ট পূর্বদিন রাত্রে আন্দামান থেকে শেষ টেলিগ্রাফ পেয়েছে—দীনেশ বণিক ও সুখেন্দু দাম চরম নিমজ্জন অবস্থায় পৌঁছেছে। বন্দীদ্বয় মারা গিয়েছে এই কথা বলাও অসম্ভব—মারা যায় নি একথা বলাও অসুবিধাজনক। গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে তাই ঘোষণা করা হলো : "আমরা আন্দামান থেকে সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে হাউসকে সঠিক সংবাদ জানাব।" বিরোধীদলের প্রতিনিধিরা এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ আইনসভা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁরা যোগ দিলেন বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতার গণ-মিছিলে। কলকাতায় এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল। বিরাট এক জনসভায় প্রস্তাব পাস হলো : "অবিলম্বে আন্দামান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনো, সকল বন্দীকে মুক্তি দাও।" সভার পক্ষ থেকে গান্ধীজী ও রবীন্দ্র-নাথের নিকট টেলিগ্রাফ পাঠানো হলো : "আপনারা অবিলম্বে আন্দামান-বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন।"

২৭ দিনের দিন অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো বিরাট জনসভা। সমস্ত কলকাতা যেন ভেঙে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ বললেন: "আজ আর বেশি কথার প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের ছেলেদের, এই আগুনের ফুল্‌কিগুলোকে, জাতির অমূল্য সম্পদগুলোকে সুদূর আন্দামানের নিভৃতে নিভতে দিতে পারি না। ভারত ও বাঙলা গভর্নমেণ্টকে একটা কথা ভাবতে বলছি—আজ দেশে যে সামান্য শাসন-সংস্কার এসেছে, প্রদেশে মন্ত্রিত্ব হয়েছে, এ কাদের ত্যাগ ও চরম আত্মাহুতির ভিতর দিয়ে এসেছে? জাতির এই সোনার টুকরোগুলোকে বাদ দিয়ে শাসন-সংস্কারের কথা ভাবা যায় না। তাঁদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে এনে মুক্তি দেওয়া হউক।"

এদিকে অনশনব্রতীদের অবস্থা ক্রমেই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পূর্বেই বলেছি, অনশনের চেয়ে নির্মম ও কষ্টদায়ক সংগ্রাম পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ডাঃ আবদুল কাদের চৌধুরী, অনিল মুখার্জী, সুখেন্দু দস্তিদার, নন্দ দাশগুপ্ত, সুধাংশু সেনগুপ্ত, বিনয় বসু, সমর গুহ, কেশব সমাজদার, বিরাজ দেব প্রভৃতির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিনই ১০/১২টি করে টেলিগ্রাফ বন্দীদের নিকট আসতে শুরু করল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কংগ্রেস নেতা ও বিভিন্ন সংগঠন থেকে টেলিগ্রাফ আসছে। তাঁদের সকলেরই অনুরোধ: "আপনারা অনুগ্রহ করে অনশন ভঙ্গ করুন।" যেসব বার্তায় অনশন-ভাঙার অনুরোধ আছে সরকার সেইসব চিঠি ও টেলিগ্রাফ বন্দীদের দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সেকান্দর হায়াৎ খাঁ টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছেন: "তোমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে—তোমরা অনশন ভঙ্গ করো।" অন্যান্য প্রদেশের দাবি জয়যুক্ত হয়েছে একথা আমরা বুঝলুম কিন্তু বাঙলার বন্ধুদের দাবি আদায়ের জন্য অন্যান্য প্রদেশের বন্ধুরা অনশন চালিয়ে যেতে চাইলেন।

এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের একবার একসাথে বসার কথা উঠেছিল কিন্তু সংগ্রাম-কমিটি একসাথে বসার সিদ্ধান্ত নেয় নি। কারণ, সর্বনিম্ন দাবি মেনে নেওয়ার কোনো ইঙ্গিত তখনও পাওয়া যায় নি। এদিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পাস হয়েছে। আমাদের দাবির সমর্থনে নতুন নতুন আন্দোলন গড়ে ওঠায় ও বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্তে আমাদের সংগ্রামী মনোবল বাড়ছে ঠিকই কিন্তু বন্ধুদের শরীরে তখন আর কুলোচ্ছে না। অল্প বয়সের বন্ধুরা ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছে। সকলেরই চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে। খিদেয় পেট যেন মাংসপেশী চিবিয়ে খাচ্ছে। রাত্রেও ঘুম নেই।

এই পরিস্থিতিতে ৩৬ দিনের দিন রাত্রে চীফ কমিশনার এলো গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাফ নিয়ে। এই দুইটি টেলিগ্রাফ পেয়ে আমরা খুবই খুশি। ইতিমধ্যে জেলার এসে আমাদের বললো: "দেখ, তোমাদের দলের নেতাদের টেলিগ্রাফ এনেছি", এই কথা বলে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর টেলিগ্রাফ বিজয় সিং-এর হাতে তুলে দিল। আমরা বুঝলুম, ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। আমরা চীফ কমিশনার ও জেলারকে বললুম, আগামীকাল ভোরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। জেলার সাহেবকে বললুম, আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে বেশ কিছু রাত পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাত্রেই আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভোরে স্নান করে ৮টার সময় আমরা সভায় বসব। স্ট্রেচার, জল ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা ঠিক থাকা চাই। সরকারী কোনো কর্মচারী আমাদের সভায় থাকতে পারবে না। যেসব টেলিগ্রাফ ও চিঠি আমাদের নামে এসেছে, সবই আমাদের দিতে হবে। জেলার সাহেব সি. এম. ও-র সাথে পরামর্শ করে আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাফ এবং বিভিন্ন প্রদেশের

মুখ্যমন্ত্রীদের টেলিগ্রাফ আমাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা প্রধানত দুটো টেলিগ্রাফের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলুম। একটি হলো গান্ধীজীর টেলিগ্রাফ, অপরটি হলো কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর টেলিগ্রাফ। প্রথমটিতে আমাদের মুক্তি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে আমাদের সর্বনিম্ন আশু দাবি পূর্ণ হবার নিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো টেলিগ্রাফগুলোর সব কথা আজ আর আমার সঠিক মনে নেই।

যতটুকু মনে পড়ছে—গান্ধীজীর টেলিগ্রাফে ছিলঃ "সমস্ত দেশ তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছে। আমি তোমাদের পূর্ণ স্বস্তির জন্য (for your full relief) সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব। অনুগ্রহ করে তোমরা অনশন ভঙ্গ করে অবিলম্বে আমাকে জানাও। আমি ক্যাম্প ও জেলের অন্যান্য রাজবন্দীদের জানাতে পারব। আমি খুব খুশি হব যদি তোমরা হিংসা (violence) সম্পর্কে তোমাদের মতামত জানাও।"—এম. কে. গান্ধী, দিল্লী।

গান্ধীজীর টেলিগ্রাফটি এসেছে দিল্লী থেকে, ভারত গভর্নমেণ্টের হাত ঘুরে। আমাদের তাই বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, গান্ধীজীর সাথে গভর্নর জেনারেলের পত্রালাপ হয়েছে। আমরা বুঝলুম, অবিলম্বে মুক্তি না পেলেও আমাদের মুক্তির প্রশ্নটা সম্মুখে এসেছে এবং গান্ধীজী তার দায়িত্ব নিয়েছেন।

এদিকে কমরেড আহমদ ও কমরেড মুখার্জীর টেলিগ্রাফে বোঝা গেল যে, আমাদের সর্বনিম্ন দাবি পূর্ণ হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং বন্ধুরা বাঙলা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে। এটাই ছিল আমাদের কাছে সংকেত দেবার ব্যবস্থা। সেই অনুযায়ী তাঁরাও বাঙলা এসেম্বলী থেকে টেলিগ্রাফ করেছেন: "...তোমাদের দাবি পূর্ণ হবে—অবিলম্বে অনশন ভঙ্গ করে আমাদের জানাও—আমরা বিভিন্ন জেল ও ক্যাম্পে সংবাদ পাঠাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে বেলা ৪টা বেজে গেল। "Full relief" কথাটার সত্যিকার অর্থ কি, এ নিয়ে বিতর্ক চললো। গান্ধীজীর নিকট থেকে কথাটার অর্থ পরিষ্কার না হবার পূর্বে সর্দারজী অনশন ভঙ্গ করতে রাজী নয়। দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাব থেকে যে-সংকেত পাবার কথা ছিল তা-ও তিনি পান নি। সর্দারজী বললেন, তোমরা সমস্ত হাউস যখন একদিকে তখন তোমরা অনশন ভঙ্গ করো। সর্দারজীর সঙ্গে ধন্বন্তরী, বিজন সেন, অমল বাগচী, হাজরা সিং, ভবরঞ্জন পতিতুণ্ডু, হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ গোপ্ প্রমুখ আরো ৮/৯ দিন অনশন চালিয়ে গেলেন। গান্ধীজী আমাদের টেলিগ্রাফের উত্তরে জানালেন—"Full relief means release…"। এই টেলিগ্রাফ পাবার পর তাঁরাও অনশন ভঙ্গ করেন।

আমরা গান্ধীজীকে টেলিগ্রাফে জানালুম: "আমাদের দাবি পূর্ণ হবে—দেশবাসী ও তোমাদের উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে অনশন তুলে নিলুম। তুমি ক্যাম্পে ও জেলের বন্ধুদের জানিয়ে দাও। আমরা আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি, আমরা গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করত তারাও সেই পথ ত্যাগ করেছে।"

কলকাতায় এসেম্বলী হাউসের ঠিকানায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর নিকট টেলিগ্রাফ পাঠানো হলো: "আমাদের দাবি পূর্ণ হবে দেশবাসী ও আপনাদের উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমরণ অনশন তুলে নিলুম। আপনারা অনুগ্রহ করে ক্যাম্প ও জেলের বন্ধুদের অনশন ভঙ্গ করতে আমাদের অনুরোধ জানাবেন।"

দীর্ঘ ৩৭ দিনের দিন আন্দামান-রাজবন্দীদের আমরণ অনশন শেষ হলো। অনশন ভঙ্গের এক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাব, বিহার, ইউ. পি, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এবং বাঙলার প্রায় ৫০ জন রাজনৈতিক বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

দ্বীপান্তরের শেষঃ ঘরে ফেরার পালা

অনশন-সংগ্রাম সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি। এই সংগ্রাম শুধু যে কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক তাই নয়, অনশন তিল তিল করে মানুষের স্বাস্থ্যকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অনশনের পর মাথা ঠিক রেখে সংযমের সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা খুবই কষ্টসাধ্য। রাক্ষুসে ক্ষুধা তখন মানুষকে পাগল করে দেয়; যেখানে যা পাওয়া যায়, টাটকা-বাসী, পুষ্টিকর-অপুষ্টিকর কোনো কিছু বিবেচনা না করেই তা খেতে ইচ্ছা করে। আমরা পশুস্তর থেকে মানুষের স্তরে কতটা উন্নীত হয়েছি তার একটা পরীক্ষা যেন তখন দিতে হয়। অনেক বন্ধুরই অনশনের পর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কিছু কিছু বন্ধুকে সংযত ও সুস্থ রাখার অসম্ভব খাটুনিতে আমার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গেল, আমার গলা ও মুখ ফুলে উঠল। আমাকে স্বাস্থ্যগত কারণে তাই নভেম্বর মাসে আন্দামান থেকে বাঙলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এবারও জাহাজে আমরা মাত্র দু-জন বন্দী। আমি ও রাধাবল্লভ গোপ এবং দু-জনেই অসুস্থ।

আবার আমার জন্মভূমি বাঙলাদেশে ফিরে এলুম, ফিরে এলুম সেই চিরপরিচিত আলীপুর জেলে। জেলে এসে কিন্তু মোটেই মনে হলো না যে, দেশে সামান্যতম শাসন-সংস্কারও এসেছে। সেই ডিভিশন থ্রি, লপসী ও খাট্টা খাওয়া, ফাইল দিয়ে কাজে যাওয়া,

বিনা-চিকিৎসায় বন্ধুদের মৃত্যু—সবই চলেছে। আমাদের জেলে পৌঁছাবার কয়েকদিনের ভিতরই তরতাজা জোয়ান ছেলে ফণী নন্দী, লক্ষ্মণ সিং এবং আরো একজন বন্ধুর আলীপুর জেলে টি. বি. ওয়ার্ডে মৃত্যু হলো। আমাদের ধৈর্য ক্রমেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঢাকা জেলে, লক্ষ্ণৌ জেলে এবং বিহার জেলে রাজবন্দীরা মুক্তির দাবিতে অনশন শুরু করে দিলেন। এই অনশনের ফলে ঢাকা জেলে বীর হরেন মুন্সির মৃত্যু ঘটলো। আমরা কয়েকবার আলীপুর জেল থেকে গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রাফ পাঠালুম: "অবিলম্বে আন্দামান-বন্দীদের ফিরিয়ে আনার ও মুক্তির চেষ্টা করুন। বন্ধুরা বিনা-চিকিৎসায় এবং বিভিন্ন কারণে আজ মৃত্যুমুখে—আমরা অবিলম্বে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

আমরা বাঙলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এবং বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে দেখা করার জন্য বহু দরখাস্ত ও বিভিন্ন কায়দায় চাপ সৃষ্টি করলুম। অবশেষে বঙ্গীয় আইন-পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসু আমাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে এলেন। তিনি বাইরের অবস্থাটা আমাদের নিকট খোলাখুলি বললেন। বললেন: "মুক্তি সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না; বিনাবিচারের বন্দীরা এখনও মুক্তি পায় নি। এই বিষয় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্ট ও বাঙলা গভর্নমেণ্টের কথাবার্তা চলছে। তবে আন্দামান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং সকল বন্দীকে উচ্চশ্রেণীভুক্ত করা, অর্থাৎ ডিভিশন 'টু'-র মর্যাদা দেওয়া—এই বিষয়ে বাঙলা গভর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কত দিনে কার্যকর হবে বলা শক্ত। এদের রাখার মতো স্থান নেই, নানা কারণে ব্যবস্থা করতে পারছি না প্রভৃতি কথা বলে এই মুহূর্তে বন্দীদের উচ্চশ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারটা তারা এড়িয়ে যাচ্ছে।" আমরা বিস্তারিতভাবে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে শরৎবাবুর সঙ্গে আলোচনা

করলুম। তিনি অবিলম্বে সম্পূর্ণ বিষয়টি গান্ধীজীকে জানাবেন এবং আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করবেন, এই কথা বলে বিদায় নিলেন। এরপর পূজার সময় শরৎবাবু ও বিমল-প্রতিভা দেবী আমাদের জন্য প্রচুর খাবার পাঠালেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী বাঙলাদেশে এলেন। তিনি হিজলী ক্যাম্প ও প্রেসিডেন্সি জেলে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আলীপুর জেলে।

প্রথমেই গান্ধীজী আমাদের উদ্দেশে 'নমস্তে' সম্বোধন করে হাসতে হাসতে বললেন : "Please sit down comrades. I am also a communist minus violence. …গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) আমাকে দায়িত্ব নিতে বলার পর থেকে আমি তোমাদের দাবি অনুযায়ী সকল রাজবন্দীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছি। এখনো জানি না কতটুকু কৃতকার্য হব। বুঝতেই পারছ, তোমাদের মুক্তি সহজ ব্যাপার নয়। আমি বড়লাটকে লিখেছি—আন্দামান-বন্দীসহ বিনাবিচারে বন্দী সকলকে মুক্তি দাও। বাঙলা গভর্নমেণ্ট আমাকে জানিয়েছে, তাঁরা শীঘ্রই আন্দামান-রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। বাঙলা গভর্নমেণ্টের নিকট আমিও চিঠি লিখেছি। এবার দেখা করে বাঙলা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা বলবো। আমার হাত শক্ত করার জন্য তোমরা আমার নিকট একটা কথা বলো—হিংসা, অর্থাৎ Violence সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? একথা মনে করো না যে, আমার নিকট যেসব কথা তোমরা বলবে তা বাইরে প্রকাশিত হবে বা এর দ্বারা তোমাদের মুক্তির প্রচেষ্টায় সামান্যতম বিঘ্নও সৃষ্টি হবে। তা কিছুতেই হবে না। তোমরা তো জানই, পৃথ্বী সিং সহ কত হিংসাপন্থী বন্ধুর মুক্তি ও জীবন রক্ষার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। তোমাদের মুক্তি সাপেক্ষে উচ্চশ্রেণীভুক্ত করার দাবি আমি বাঙলা

গভর্মেণ্টকে অবিলম্বে মেনে নেওয়ার জন্য বলবো।”

আমাদের মধ্যে তখন কমিউনিস্ট ব্যতীত অহিংসপন্থীসহ বহু মতের রাজনৈতিক বন্দীরাই ছিলেন। আমরা সকলেই কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করা সম্পর্কে একমত ছিলুম। আমরা পূর্বেই আলোচনা করে নিয়েছিলুম যে, আমরা বলবো—“আমরা সকলেই কংগ্রেসে কাজ করবো।” এর বাইরে আর কিছু বলবো না।

গান্ধীজী বললেন: “কংগ্রেস তো অনেক বড় জিনিস। কংগ্রেসে আমি রয়েছি, পণ্ডিত জওহরলাল রয়েছেন, সুভাষবাবু রয়েছেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডাঙ্গেও রয়েছেন। তোমাদের কাজের ঝোঁকটা কোন দিকে—কার সাথে মিশে তোমরা কাজ করতে চাও।” আমরা বললুম: “আমাদের ভিতর কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট—এমন কি গান্ধীবাদী (রাখাল দে) লোকও রয়েছে। মুক্তি পেলে সকলেই কংগ্রেসে কাজ করবো।”

গান্ধীজী বললেন: “কোনো কোনো বড় অফিসার আমাকে বলেছে, তোমরা আমাকে খুন করতে চাও। তোমরা অধিকাংশই কমিউনিস্ট হয়েছ। আমি তাদের বলেছি, আন্দামান-বন্দীরা এত অবিবেচক নয়, কমিউনিস্ট হলেও আন্দামান-বন্দীরা হলো patriot of patriots। তাঁদের দেশপ্রেম সীমাহীন। আমার অনুরোধ তোমরা এখন আর অনশন করো না। উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা অবিলম্বে পাওয়া সম্পর্কে আমি বাঙলা গভর্মেণ্টের সঙ্গে কথা বলবো। বুঝতেই পারছ, প্রথম প্রশ্ন—আন্দামান-বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন। তোমরা নিশ্চিত হতে পার আমার পক্ষে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। বুঝতেই পারছ, তোমাদের মুক্তি না দেবার পিছনে বহু শক্তি কাজ করছে। আমার উপর যখন দায়িত্ব রয়েছে তখন অনশন করো না, গোয়ার্তুমি করো না কেউ। আমার হাতকে শক্তিশালী করো, সাহায্য করো।”

গান্ধীজী আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ইতিমধ্যে আমরা সংবাদ পেলুম যে, আন্দামান-বন্ধুরা সরকারকে চরমপত্র দিয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তারিখ ঘোষণা না করলে—তারা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনশন শুরু করবে। আমরাও আন্দামান-বন্ধুদের সমর্থনে চরমপত্র দিলুম।

কিছুদিন পরেই আমরা কানাঘুষা শুনলুম—দমদম জেলের ভিতর আমাদের জন্য ৭০০টি বিশেষ সেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ডিসেম্বর মাসের শেষে আলীপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল দাস আমাদের জানালেনঃ "তোমরা আর চিন্তা করো না—তোমাদের বন্ধুরা আন্দামান থেকে শীঘ্রই ফিরে আসছে। একথা গভর্নমেণ্ট আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।"

১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ভোর ৪টায় সময় আমাদের ঘুম থেকে তোলা হলো। দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের বলা হলো—সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও, সবাই দমদম জেলে যাচ্ছ। আজ থেকেই তোমরা সকলে ডিভিশন 'টু'-র মর্যাদা পাচ্ছ। আন্দামান থেকে আজই তোমাদের বন্ধুরা বাঙলা দেশে ফিরে আসছে।

তারপর প্রায় ১০০ জন রাজবন্দীকে দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সকলকে ডিভিশন 'টু'-র মর্যাদা দিয়ে কিচেন রাজবন্দীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং আলীপুর জেলে অন্যান্য আন্দামান-বন্দীদের ডিভিশন 'টু' করে রাখা হলো। আন্দামান-বন্দীদের বিভিন্ন জেলে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে রাখার এই যে ব্যবস্থা তা মুক্তির পূর্বদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এইভাবে অশ্রু ও আত্মদানে মহিমান্বিত, বহু লাঞ্ছনা ও বীরত্বে পূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কয়েকজন বীরবন্ধুকে চিরবিদায় দিয়ে, বহু ভগ্নস্বাস্থ্য বন্ধুকে নিয়ে আন্দামান-রাজবন্দীরা ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি জন্মভূমি বাঙলা মায়ের কোলে আবার ফিরে এলো।

ইতিমধ্যে দুনিয়ার বুকে ও ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক গুরুত্ব-

পূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীরা ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়েছে। বিহার, ইউ. পি. ও মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে সাজাপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের মুক্তিও আদায় করে নিল। বাঙলা গভর্নমেন্টও একটি কমিশন বসিয়ে কিছু কিছু আন্দামান-বন্দীদের মুক্তি দিল। কিন্তু ৪৫ জন বন্দী সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা হলো—এই সমস্ত দুর্ধর্ষ 'dangerous' বন্দীকে সরকার কিছুতেই 'ক্ষমা' প্রদর্শন করতে পারে না। এই নিষ্ঠুর ঘোষণায় বাইরের বন্দী-মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয় এবং কারাগারে বন্দীদের মধ্যেও সৃষ্টি হয় চরম বিক্ষোভ। ইতিমধ্যে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন। অনশন যখন প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে তখন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজীর সঙ্গেও পুনরায় দেখা হলো। আন্দামান-বন্দীরা কোনো উপায় না পেয়ে পুনর্বার অনশন শুরু করল। ৩২ দিন অনশনের পর মুসলিম লীগের পক্ষে আবদুর রহমান সিদ্দিকি (কলকাতার মেয়র) ও কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসুর প্রতিশ্রুতিতে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। অনশন ভঙ্গ করার সময় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ীও উপস্থিত ছিলেন। তখন বাঙলার বিভিন্ন জেলে মাত্র ৪০ জন আন্দামান-রাজবন্দী আটক ছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সুতরাং বাকী রাজবন্দীরা আর মুক্তি পেল না।

এরপর ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও মজুর-কৃষকের নানা আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষের কারাগার আবার হাজার হাজার রাজবন্দীতে পূর্ণ হতে শুরু করল। দুনিয়াব্যাপী বিরাট পরিবর্তন ও ফ্যাসিস্ট শক্তির চরম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালে রক্তক্ষয়ী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ গর্জে উঠল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি এবং নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে সমগ্র ভারত জুড়ে উত্তাল গণ-আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের রাজবন্দীরা মুক্তি পেলেও আন্দামান-রাজবন্দীরা মুক্তি পেল না। দেশে পুনরায় আইনসভার নির্বাচন হয়ে গেল তবুও আন্দামান-বন্দীরা মুক্তি পায় না। অবশেষে আবার আন্দামান-রাজবন্দীরা আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিল এবং গভর্নমেণ্টকে চরম-পত্র দিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ভয়াবহ নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর—অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বিরাট গণআন্দোলনের চাপে শহীদ সোহরাবর্দী-মন্ত্রিসভা আন্দামান-রাজবন্দীদের মুক্তি দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে গণ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানব-ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দুনিয়াব্যাপী ধনতান্ত্রিক সমাজের চরম সংকটে দেশে দেশে অমর জনতার বিপ্লবী সংগ্রামের মাঝে ভারতবর্ষও গণ-বিপ্লবের মুখে এসে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিশয়াশীল শক্তি দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিতর দিয়ে গণ-বিপ্লবকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা বিভক্ত করে। এই সময় মজুরশ্রেণী আর গণতান্ত্রিক শক্তিও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। অপরদিকে গণবিপ্লবের ভয়ে আপসপন্থী বুর্জোয়া কংগ্রেস-নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের ভিত্তিতে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আন্দামানের বীরবন্দীরা সুদীর্ঘ কারাজীবনের শেষে ফিরে এলেন অন্ধকার থেকে মুক্ত আলো-হাওয়ার রাজ্যে। একদিন যে শপথ

নিয়ে তাঁরা বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, মার্কসবাদের বিশ্ব-বীক্ষায় তাঁরা নতুন করে শাণিয়ে নিলেন সেই বিপ্লবী-শপথ। আর সন্ত্রাসবাদ নয়, শ্রেণী-সংগ্রামের পথে মজুর-কৃষক মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য গ্রামের মাঠে মাঠে, কলে-কারখানায়, শহরে-গঞ্জে, মানুষের মিছিলে অতঃপর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো স্বাধীনতা-সংগ্রামী মুক্ত আন্দামান-বন্দীদের দৃপ্ত পদধ্বনি।

পরিশিষ্ট

এক নজরে আন্দামানের কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর কথা

[১৯১০ থেকে ১৯৩৮ সাল]

সেলুলার জেলে অনশন ও মৃত্যু :

১. পণ্ডিত রামরক্ষা : তিন মাসের অনশনে মৃত্যু। ১৯১৭ সাল।

২. মহাবীর সিং : ৬ দিনের দিন মৃত্যু। ১৭ই মে, ১৯৩৩ সাল।

৩. মোহিত মৈত্র : ১২ দিনের দিন মৃত্যু। ২৩শে মে, ১৯৩৩ সাল।

৪. মোহনকিশোর নমঃদাস : ১৩ দিনের দিন মৃত্যু। ২৪শে মে, ১৯৩৩ সাল।

আন্দামান জেলে মৃত্যু :

১. ইন্দুভূষণ রায : সেলুলার জেলে আত্মহত্যা। ১৯১৮ সাল।

২. ভান সিং : জেল-কতৃপক্ষ কর্তৃক পিটিয়ে হত্যা। ১৯১৮ সাল।

৩ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য : অসুখে মৃত্যু। ১৯১৮ সাল।

অসুস্থ অবস্থায় বাঙলাদেশের জেলে চিকিৎসার জন্য আনার পর মৃত্যু :

১. ফণিভূষণ নন্দী : আলিপুর জেলে। ১৯৩৭ সাল।

২. মহেশ বড়ুয়া : রাজসাহী জেল। ১৯৪০ সাল।

জেল-কর্তৃপক্ষের নৃশংস অত্যাচারে অনেক বন্ধুই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক বন্ধুই আজ রোগমুক্ত। দুই-একজন বন্ধু মৃত্যুও বরণ করেছেন। এখানে শুধু সেই সমস্ত বন্ধুদের নাম উল্লেখ করা হলো যাঁদের সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল :

১. উল্লাসকর দত্ত ২. সুরেন কর ৩. ফণী দাশগুপ্ত ৪. ভূপেশ ব্যানার্জী ৫. সরোজ গুহ ৬. ভূপেশ গুহ ৭. হৃদয় দাস ৮. বিমল চক্রবর্তী ৯. কুমুদ মুখার্জী ১০. ধীরেন ভট্টাচার্য ১১. অভয় দাস

১৯৩৪ সালে যে-সমস্ত বন্ধুদের আন্দামানে বর্বর মধ্যযুগীয় আইনে ১৫টি করে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়েছিল :

১. প্রবীর গোস্বামী (ময়মনসিংহ) ২. সুখেন্দু দাম (ময়মনসিংহ) ৩. চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য (কুমিল্লা)।

কারামুক্তির পর আন্দামানীদের যেসব বন্ধু গণ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন:

১. সুশীল দাশগুপ্ত: কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মিছিলে নিহত।

২. লালমোহন সেন: নোয়াখালির দাঙ্গায় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সন্দীপে নিহত।

৩. হাজরা সিং: টাটানগরে মজুর-ধর্মঘটে মালিক পক্ষের ষড়যন্ত্রে নিহত।

৪. বিজন সেন: ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজসাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আরো ৬ জন বন্দীসহ মুসলিম লীগ সরকারের গুলিতে নিহত।

৫. কালী ব্যানার্জী: ২৪ পরগণায় কৃষক-আন্দোলন করতে গিয়ে কৃষকের বাড়িতেই মৃত্যু বরণ।

৬. প্রিয়দা চক্রবর্তী: পলাতক অবস্থায় কৃষক-আন্দোলন করতে গিয়ে চট্টগ্রামে মৃত্যু বরণ।

৭. ভূপেন ভট্টাচার্য (হিটু): ময়মনসিংহের হাজং এলাকায় লড়াইয়ের ময়দানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ।

৮. ধন্বন্তরী: কাশ্মীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। পার্টির কাজে গ্রামাঞ্চলে মৃত্যু বরণ।

৯. সুবেন ধরচৌধুরী: পশ্চিম বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। মিছিলের মধ্যে আততায়ীর ডাণ্ডায় গুরুতর আহত এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যু।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অনুচ্ছেদ/পংক্তি	ছাপা হয়েছে	হবে
১৮	তৃতীয়/১১ পংক্তি	দেওয়া হতো না	বাধ্য করা হতো
২৮	তৃতীয়/২৩ পংক্তি	—	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
৩০	দ্বিতীয়/২২ পংক্তি	নেতৃত্বে	নেতৃত্বে
৩২	দ্বিতীয়/ ৪ পংক্তি	শিববর্মী	শিব বর্মা
৬৪	দ্বিতীয়/ ৭ পংক্তি	স্বল্প জল খাচ্ছেন	স্বপ্নে জল খাচ্ছেন
৮১	প্রথম/ ১ পংক্তি	এদের অধিকাংশ	অন্যান্যরা
১৪১	দ্বিতীয়/১৬ পংক্তি	সুবোধ রায়	প্রবোধ রায়
১৪২	দ্বিতীয়/৯ পংক্তি	শক্তি সেন	শান্তি সেন